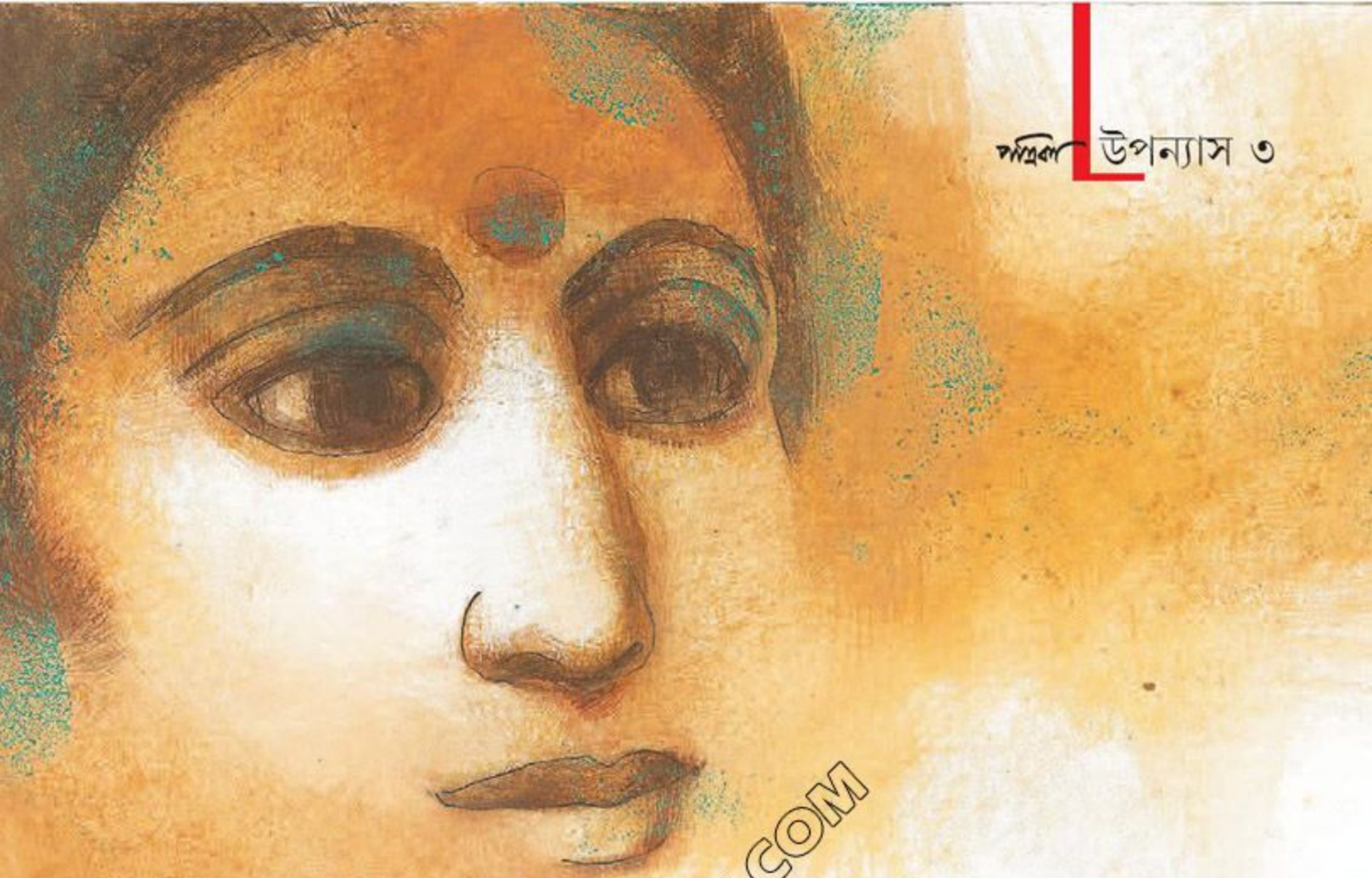

AMARBOI.COM

এক-একটা দিন অন্যরকম

নীললোহিত

এখন রাত দু'টো-টুটো হবে। এটাই আমার পক্ষে চিঠি লেখার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। অন্যসময় কিছু লিখতে বসলেই আমার লজ্জা করে। কেন যে লজ্জা করে তাও আমি জানি না। তবে একদিন আমার বন্ধু প্রীতম একটা কথা বলে আমার মনে খুব দাগা দিয়েছিল।

সেবারে প্রীতম আর আমি কোথা থেকে ফিরছিলাম, ঝাঁঝা স্টেশনের ওয়েটিংরুমে বসেছিলাম ট্রেন বদলানোর জন্য। প্রীতম বাথরুমে গিয়েছে, তখনই আমার একটা জরুরি কথা মনে পড়ে গেল। আমার সঙ্গে একটা নোটবুক থাকে সবসময়, আর সঙ্গের ঝোলাব্যাগে রয়েছে দু'টো কমদামি কলম, তাই লিখতে শুরু করেছিলাম। বাথরুম থেকে বেরিয়েই প্রীতম যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠে চোখ গোল-গোল করে বলল, "কী রে নিলু, তুই ও কী করছিস? পদ্য লিখছিস নাকি? সর্বনাশ।"

কবিতা লেখার সঙ্গে সর্বনাশের কী আছে তা বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

ও আবার বলল, "দ্যাখ নিলু, আমাদের এই বাংলা ল্যাঙ্গোয়েজে বড্ড বেশি রাইটারদের ভিড়। প্রত্যেকদিন এগারোজন করে নতুন লেখক গজাচ্ছে। ছেলেদের যখনই গোঁফ গজাতে শুরু করে, তখনই তাদের গায়ে চুলকুনি ওঠার মতো কবিতা লেখার ধুম পড়ে যায়। আর মেয়েদের যদিও গোঁফ গজায় না, তবু তাদের অনেকেই ওই

বয়সের মতো কবিতা লেখে! তুইও সেই দলে ভিড়ছিস নাকি? প্লিজ নিলু, ডোন্ট ডু দ্যাট। একদিন দেখবি, এত শত রাইটারদের ওজনে বাংলা সাহিত্যটাই ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়বে!

প্রীতম বেশ নামী ফোটোগ্রাফার। অনেক টাকা রোজগার করে সেই জন্যই বোধ হয় তার ধারণা হয়েছে, সব বিষয়েই তার মতামত দেওয়ার অধিকার জন্মে গিয়েছে। আমার উপর ও মাঝে-মাঝেই লেকচার ঝাড়ে।

কাছে এসে প্রীতম বলল, "দেখি, দেখি, তুই কী লিখছিস?"

আমি সঙ্গে-সঙ্গে ডায়েরিটা বন্ধ করে প্যান্টের পকেটে চালান করে দিলাম।

মোটেই কবিতা লিখছিলাম না আমি। সে সাহসই আমার নেই। যা লিখেছি, সেটা কাউকে দেখানোও যায় না। প্রেমপত্র নয়। লিখছিলাম গত এক সপ্তাহের বাজার খরচের হিসেব। আমাদের বাড়িতে প্রতিদিন বাজার করার ভার আমার উপর। এতদিন চলছিল বেশ। হঠাৎ আমার দাদা একটা নিয়ম করেছে যে, আমাকে প্রতি সপ্তাহের হিসেব লিখে দেখাতে হবে।

এটা আমার দাদার অন্যায়। সে ভাল চাকরি করে, সংসারের সব খরচ সে-ই দেয়। তার বেকার ছোট ভাইটি যদি রোজ বাজার খরচ থেকে দু'-পাঁচ টাকা না সরায়, তা হলে তার চলবে কী করে?

আমি যে কবিতার বদলে বাজার খরচ লিখছি, এটা কাউকে, বিশেষত কোনও বন্ধুকে জানানো চলে না। তাতে তাদের ঠাট্টা-ইয়ার্কির খোঁচা আরও বেড়ে যাবে!

সেদিন প্রীতমের কথাটা আমার মনে খুব আঘাত দিয়েছিল, সে

কথাও অবশ্য জানাইনি প্রীতমকে।

এখন এই গভীর রাতে কোথাও কোনও আওয়াজ নেই, সমস্ত শহরেই যেন ছড়িয়ে আছে ঘুম। এই সময় জেগে থাকলে নিজেকে পরিপূর্ণ স্বাধীন মনে হয়। এখন যা খুশি করা যায়। নিজেকে নিয়ে।

এই সময় কিছু লেখাপড়াও করা যায়। না, না, কবিতাও না, বাজার খরচও না। একটা দরকারি কাজ, একটা চিঠি। ঝরনাদি আমায় একটা চিঠি দিয়েছেন, সেই চিঠির উত্তর আর দু'দিনের মধ্যে ওঁর কাছে পৌঁছনো দরকার।

আজকাল তো শুনছি চিঠি লেখা উঠেই গিয়েছে। এই মোবাইল ফোনের যুগে সংক্ষিপ্ত এসএমএস-ই যথেষ্ট। তাতে কাগজ লাগে না, ডাকটিকিট লাগে না, থুতু দিয়ে খাম জুড়তে হয় না, সত্যিই খুব সুবিধেজনক। কিন্তু ঝরনাদি নিজের হাতে লেখা তিনপাতার একটা চিঠি লিখেছেন আমাকে, সেই জন্য আমারও হাতে লিখেই চিঠির উত্তর দেওয়া উচিত, তাই না?

ভেবে-ভেবে চিঠিটা লিখতে হচ্ছে। হঠাৎ একসময় একটা শব্দের বানান সম্পর্কে খটকা লাগল। 'সম্ভা'য় একটা ব-ফলা আছে না? সেটা কি একটা ত-এর নীচে, না দু'টো ত। কিংবা এই ব-ফলা প্রথমেই স-এর নীচে? যত ভাবছি, ততই গুলিয়ে যাচ্ছে। ডিকশনারি না দেখে উপায় নেই। কিন্তু ডিকশনারি দেখার একটা বিপদ আছে। যে শব্দটি আমি খুঁজছি, সেটা পাওয়ার আগেই অন্য-কোনও অচেনা শব্দ দেখলে সেদিকেই চোখ চলে যায়। তারপর আর একটা অজানা শব্দ। এই সব নিয়েই কেটে যায় অনেকটা সময়, লেখার কথাটা মাথায় উঠে যায়।

নাঃ, আজই চিঠিটা শেষ না করলে পরে আর হয়তো লেখাই হবে না।

কলমটা টেবিলের উপরে রেখে আমি ডিকশনারি আনার জন্য উঠে দাঁড়াতেই কলমটা একটু গড়িয়ে এসে টুকুস করে পড়ে গেল মাটিতে।

সব লোকের হাত থেকেই কলম একবার না-একবার মাটিতে পড়ে যেতেই পারে। কিন্তু আমার কলমটা নীচে পড়ে গিয়েও থামল না। টেবিলটার পাশে যে একটা বইয়ের র‍্যাক আছে, কলমটা চলে গেল তার তলার অন্ধকারে।

তার মানে, এখন আমাকে মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে ওই বুকর‍্যাকের তলায় হাত গলিয়ে কলমটা খুঁজতে হবে। কিন্তু বুকর‍্যাকের তলার ওই ফাঁকটা খুব কম, হাত বেশি দূর যায় না। আমি বেশ কিছুটা চেষ্টা করেও নাগাল পেলাম না কলমটার।

তা হলে কি কলমটা ইচ্ছে করে লুকিয়ে রইল দূরে? হ্যাঁ, এরকম কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। আমি মনে-মনে গোপনে বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর সব কিছুরই, এমনকী জড় জিনিসেরও কিছুটা প্রাণ আছে, তাদের ইচ্ছে ও অনিচ্ছেও আছে, কলমটা কি চাইছে যে আমি ওই চিঠিটা না লিখি?

এটা দরকারি চিঠি, কলমটার আবদার মেনে সেটা না লেখার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

এখন আনতে হবে একটা ঝাঁটা, সেটার খোঁচা খেলেই কলমটা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে। ঝাঁটা কোথায় থাকে? এটা জানা যে আমার পক্ষে জরুরি, তা আগে কখনও মনে হয়নি। যদি দাদা-বউদির ঘরে থাকে, তবে তো সেখানে খোঁজার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মায়ের ঘরে একটা ঠাকুরের মূর্তি আছে, সেখানে কি ঝাঁটা থাকতে পারে? ঠাকুরের মূর্তি আর ঝাঁটার সহ-অবস্থান কি সম্ভব? রান্নাঘরে কিংবা বাথরুমে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। একটা ছাতা কিংবা লাঠি-ফাঠি পেলেও চলবে!

সে জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

তখনই চোখে পড়ল জানালা দিয়ে রাস্তাটা। আমি চেয়ারে বসে থাকলে রাস্তা দেখা যায় না। এই দৃশ্যটা আমার বড় প্রিয়। সব আলো জ্বলছে, ঝকঝক করছে রাস্তাটা। খানাখন্দ এখন আর চোখে পড়ে না, মনে হয় খুবই চমৎকারভাবে পরিচ্ছন্ন। কিন্তু কোনও মানুষ নেই, গাড়ি-ঘোড়া নেই, এ যেন ঘুমন্তপুরী। এমনকী একটা কুকুরও নেই। যেন সমস্ত মানুষ ও প্রাণী এ শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে। এমন অপার নিঃসঙ্গতা আর কোথাও অনুভব করা যায় না।

ঝাঁটার কথা ভুলে গিয়ে আমি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম জানালার ধারে। ঠিক তখনই একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটল।

হুস করে একটা ট্যাক্সি এসে থামল আমাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে, দু'টো গলির ক্রসিং-এ।

এই সময় প্রাইভেট গাড়ি একেবারেই চলে না বলতে গেলে। তবে ট্যাক্সি যায়, বোধ হয় কিছু কিছু ট্যাক্সির সারারাত ডিউটি থাকে।

গত সপ্তাহেই তো আমার দাদাকে দিল্লি যেতে হল। ফ্লাইট ভোর ছ'টার সময়। অন্তত রাত চারটের সময় বাড়ি থেকে বেরোতে হবে, সে জন্য পাড়ার এক ট্যাক্সিড্রাইভারকে বলে রাখা ছিল। সে ঠিক

AMARBOI.COM

পৌনে চারটের সময় এসে হর্ন দিল।

এত রাতে আমাদের পাড়ায় কে এল। তা জানার জন্য কৌতূহল তো হবেই। দাঁড়িয়ে রইলাম জানালার পাশে।

বেশ কয়েক মিনিট ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে রইল।

অনেক সময় ট্যাক্সিতে আসতে-আসতে যাত্রীদের মধ্যে অনেক কথা হয়, কিন্তু সব কথা শেষ হয় না। একেবারে বাড়ির কাছাকাছি এসে কোনও জরুরি কথা মনে পড়ে যায়।

আমার এখান থেকে অবশ্য কোনও কথাবার্তা শোনা যায় না। একটু পরে ট্যাক্সির দরজা খুলে নামলেন এক মহিলা। মুখটা ঠিক দেখা গেল না, তবে শরীরের সংস্থান বেশ ভাল।

নেমে দাঁড়িয়ে সেই মহিলা অন্য যাত্রীদের দিকে হাত নাড়লেন। তখনই একটা কাণ্ড ঘটল। ট্যাক্সির সামনের দিক থেকে একজন পুরুষ নেমে এসে মহিলাটির হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। সম্ভবত সে ওই মহিলাকে আরও কিছুক্ষণ সঙ্গে রাখতে চায়। মহিলা তাতে রাজি নন।

আবার একজন পুরুষ নেমে এল ট্যাক্সি থেকে। সে এসেই দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মহিলাটিকে।

আমি খুব অস্পষ্টভাবে শুনতে পেলাম, "না, না, না..."

এর পরেই শুরু হল আসল নাটক। দ্বিতীয় লোকটি মহিলার কোমর ছেড়ে ফস করে বার করল একটা রিভলভার!

ওরে বাবা, এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার।

প্রায় রোজই তো খবরের কাগজে পড়ি, একদম বদমাশ সুযোগ পেলেই রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যায় কোনও নারীকে, তারপর ধর্ষণ, তারপর খুন। এখানেও সেরকম কিছুই ঘটতে যাচ্ছে?

মহিলাটি কিন্তু রিভলভার দেখেও ভয় পাননি। কোনওক্রমে প্রথম লোকটির হাত ছাড়িয়ে দৌড় দিলেন একটা গলির মধ্যে। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারলেন না, ওই দু'জন লোক তাঁকে তাড়া করে আবার ধরে আনল ট্যাক্সিটার কাছে। দ্বিতীয় লোকটি তার হাতের রিভলভার নাড়িয়ে-নাড়িয়ে কী যেন বলতে লাগল তাকে।

এই রকম সময় এর পর কী হবে, এর পর কী হবে, এই রকম একটা ভাবনা বুকের মধ্যে ঠেলা মারতে থাকে। এই সঙ্গে আমার মস্তিষ্ক আমাকে এক ধমক দিয়ে বলল, 'মহিলাটিকে যদি সত্যি-সত্যি মেরে ফেলে, তা হলে তা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবে? ছিঃ! যে-কোনও পুরুষ মানুষের উচিত, এইরকম অবস্থায় মহিলাকে সাহায্য করার জন্য ছুটে যাওয়া।'

আমিও উলটে আমার মস্তিষ্ককে ধমক দিয়ে বললাম, 'আহা-হা, তুমি তো এই নীতি কথা বলেই খালাস! ওখানে দু'জন লোক, একজনের হাতে আবার রিভলভার, ওর মধ্যে আমি গিয়ে কী করে সাহায্য করব মহিলাকে? বেঘোরে আমার প্রাণটা হারাব? সিনেমার নায়করা অবশ্য, দু'টোর বদলে একডজন দুষ্কৃতি থাকলেও সবাইকে টিট করে দিতে পারে, আমার তার কণামাত্র যোগ্যতা নেই। এই তো সুটিয়া বলে একটা গ্রামে একজন ভদ্র, আদর্শবাদী যুবককে ওই ধর্ষণকারীরা নৃশংসভাবে খুন করল, কারণ, সে শুধু ওই কাজের বিরোধিতাই করেনি। এদের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে চেষ্টা করেছিল।'

হঠাৎ আমার আর-একটা কথাও মাথায় এল। এরকম একটা ভয়ঙ্কর অপরাধ ঘটতে চলেছে, অথচ আমি কি কিছুই করতে পারব না? পুলিশ এরকম খবর পেলেই নাকি সঙ্গে-সঙ্গে চলে আসে।

পুলিশের সেই এমার্জেন্সি নম্বরটা কত যেন? ঠিক দরকারের সময়ই মনে পড়ে না। যদিও এ পর্যন্ত কখনও দরকার হয়নি, তবু সেই নম্বরটা একটা কাগজে লেখা, সেটা ফ্রিজের গায়ে চুম্বক দিয়ে আটকানো আছে।

আমি যদিও জানালা দিয়ে রাস্তার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছি না। তবু মনে হল, এক দৌড়ে কাগজটা নিয়ে আসতে হবে। ঘুরে দাঁড়াতেই মনে পড়ে গেল, একশো! শুধু একশো। কাগজটা আমার নিয়ে আসার কোনও দরকার নেই। তারপরই মনে-মনে বললাম, দুর ছাই। নম্বরটা জেনেও তো কোনও লাভ নেই। টেলিফোনটা তো দাদা-বউদির ঘরে। সকাল থেকেই দাদার জরুরি ফোন আসে। দাদার ধারণা, তার বেকার ভাইটির টেলিফোন ব্যবহার করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

এত রাতে দাদার ঘুম ভাঙাতে আমার ভয় হয়। অবশ্য বাড়িতে আগুন লেগে গেলে তো ডাকতেই হয়। এরকম কোনও ঘটনা ঘটলে ডাকলে দাদা নিশ্চয়ই রাগ করবে না। কিন্তু দাদাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে তারপর এই জানালার কাছ পর্যন্ত নিয়ে আসতে-আসতে যদি এরা সরে পড়ে? কিছুই দেখতে না পেয়ে দাদা আমার দিকে কী চোখে তাকাবে?

এদিকে দু'জন পুরুষ মিলে মহিলাটির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে-করতে তাঁকে মাটিতে শুইয়ে ফেলেছে। একজন চেপে বসেছে তাঁর বুকের উপর। কিন্তু মানুষের যখন প্রথম রিপুটি চাগিয়ে ওঠে, তখন তাদের স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান থাকে না।

পিস্তল হাতে দ্বিতীয় লোকটি প্রথম লোকটির জামার কলার চেপে ধরে তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। তার বোধ হয় তবু কিছুটা ভব্যতা বোধ আছে, কিংবা, সে নিজেই বোধ হয় আগে...

ফোন করা গেল না, তবু আমি অধীরভাবে মনে-মনে বলতে লাগলাম, 'পুলিশ, পুলিশ।' আমার এই ডাকটা ঠিক প্রার্থনা নয়, বেশি জ্বরের রুগিরা যেমন ভুল বকে, অনেকটা সেই রকম। আমাদের এই পাড়াতেই ভবানীপুর থানা, সেখান থেকে একটা পুলিশের গাড়ি এই অকুস্থলে পৌঁছতে বড়জোর দশ মিনিট লাগতে পারে।

এরপর যা ঘটল, তা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। কেউ-কেউ ভাববে, আমি বানিয়ে-বানিয়ে মিথ্যে গল্প ফেঁদেছি। মাঝে-মাঝে যে আমি মিথ্যে কথা বলি না, তা তো নয়। তবে, খুব ছেলেবেলায় আমার এক কাকাকে আমি প্রায়ই বলতে শুনেছি, 'মাইরি বলছি, মা কালীর দিব্যি,' সেরকমই যদিও আমরা এখন মাইরি শব্দটা ব্যবহারই করি না, আর মা কালীর নামে দিব্যি কাটা উঠেই গিয়েছে, সেই রকমই একটা দারুণ শপথ কেটে বলতে পারি, এটা একেবারে পুরোপুরি একশো ভাগ সত্যি যে, প্রকাশ্য রাস্তায় এই গভীর রাতে দু'জন বদমাশ এক মহিলার উপর জবরদস্তি করে অত্যাচার চালাচ্ছে, এরই মধ্যে এসে পড়ল একটা পুলিশের গাড়ি! একেবারে ঠিক সময়!

আমি মনে-মনে ব্যাকুলভাবে পুলিশকে ডেকেছি বলেই পুলিশের গাড়িটি এসে পড়ল, এরকম কুসংস্কার আমার নেই। নিশ্চয়ই কাছাকাছি অন্য বাড়ি থেকে কেউ বাথরুমে যাওয়ার জন্য জেগে উঠে এই ঘটনাটা দেখে ফেলেছে, সে-ই ফোন করেছে থানায়।

সেই অজানা লোকটিকে ধন্যবাদ।

পুলিশের গাড়ি এই রাস্তায় ঢোকামাত্র সেই দু'টো লোক মেয়েটিকে ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হয়তো, দু'জনের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্যই, তারা আসল অপকর্মটি শুরুই করতে পারেনি। মেয়েটি মুক্তি পেতেই পুলিশের জন্য অপেক্ষা না করেই পাশের রমাকান্ত দাস লেনের দিকে একটা দৌড় লাগাল। রিভলভারধারী লোকটিও সঙ্গে-সঙ্গে উঠে পড়ল গাড়িতে, সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হুস্ করে বেরিয়ে গেল। অন্য লোকটি তখনও নিজেকে ঠিক সামলে উঠতে পারেনি; যে গাড়িতে সে এসেছে, সে গাড়িও তাকে নিল না। পুলিশের গাড়ি থেকে দু'জন পুলিশ টপাটপ নেমে পড়ে সেই লোকটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তখনই তাকে

AMARBOI.COM

মারধর শুরু করল না, অনেক দিনের চেনার মতো কী যেন কথাবার্তা শুরু করল। আমি অবশ্য তার কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। সেই প্রথম লোকটি তার পকেট থেকে প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরাল, প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিল দুই পুলিশের দিকে। ওদের একজন নিল, অন্যজন হাত নেড়ে দিল, অর্থাৎ সে ধূমপায়ী নয়।

তবে সিগারেট টানতে শুরু করেও তারা সেখানে পুরোটা শেষ করল না, তিনজনই উঠে পড়ল জিপগাড়িতে। তারপর সেখানে আর কোনও চিহ্নই রইল না। ভাগ্যিস দাদাকে ডেকে তুলিনি। দাদা আসতে একটু দেরি করলেই তো কিছুই দেখতে পেত না!

এর পর কি আর সেই অসমাপ্ত চিঠি শেষ করার জন্য তক্ষুনি আবার লিখতে বসা যায়? আমি এতটাই উত্তেজিত আর আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমার কপালের দু'টো শিরা এখনও দপদপ করছে।

গুলি মারো চিঠি লেখার। যতই জরুরি হোক, দেখা যাবে কাল সকালে। এখন ঘুমিয়ে পড়লেই হয়। কলমটা গোঁজারও দরকার নেই। ওকে কাল ঝাঁটাপেটা করব!

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম যে আসে না সহজে। শেষ পর্যন্ত যে রাত্তার ওই নাটকে সাংঘাতিক কিছু ঘটেনি, সে জন্য এখন তো আমার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা উচিত। কিন্তু বারবার আমার মনে পড়ছে কলমটার কথা। ও কেন ঠিক ওই সময়ই টেবিল থেকে পড়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল একটা দুর্গম জায়গায়। ওকে উদ্ধার করার জন্য উঠে দাঁড়ালাম বলেই তো পুরো দৃশ্যটা আমার দেখা হল। হাঁস-মুরগি, এমনকী গোরু-ছাগলরাও আসন্ন ভূমিকম্পের কথা বুঝে যায়, সেই রকমই কিছু-কিছু ধাতুও টের পেয়ে যায় কাছাকাছি ভবিষ্যতের। এটা আমার বিশ্বাস করতে আপত্তি নেই।

কিন্তু সে আমাকে দেখাতে গেল কেন? ওই মহিলার মুখটা মনে রাখার জন্য? কিংবা ওই বদমাশ দু'টো কিংবা দুই পুলিশের? আমায় দেখিয়েই বা কী লাভ? আমি ওদের কারও মুখই স্পষ্ট দেখতে পাইনি এতটা দূর থেকে। আমি ওদের আইডেন্টিফাইও করতে পারব না। আমি কী-ই বা করতে পারি, আমার ক্ষমতা কতটুকু? আর-একটা প্রশ্নও মনে আসতে লাগল বারবার। পুলিশকে আসতে দেখেও মহিলাটি পালিয়ে গেলেন কেন? বরং পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোই স্বাভাবিক ছিল।

তারপর এক সময় আমার দু'চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। প্রত্যেক দিনই পুরো ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমার গোটাকতক স্বপ্ন দেখে নেওয়ার অভ্যেস।

অনেক গল্প-উপন্যাসে ভুলভাবে লেখা হয় যে, সারাদিন মানুষ যেসব কাজকর্ম করে, কিংবা তার কিছু অপূর্ণ বাসনা, তারই ইচ্ছেপূরণ দেখা যায় স্বপ্নে। মোটেই তা সত্যি নয়। স্বপ্নে দেখা যায় যত সব উলটোপালটা জিনিস। কোনও স্বপ্নই নাকি কয়েক সেকেন্ডের বেশি চলে না, অথচ এক-এক সময় মনে হয় চলছে তো চলছেই। পরের দিন সকালে কিছু মনেই থাকে না। দু'-একটি ব্যতিক্রমও হয়।

যেমন, আজ আমি একটা স্বপ্নে দেখলাম, আমার খুব বন্ধু, সরিৎ চিৎকার করে বলছে, 'মাইরি আমি বিয়ে করতে চাই। বিয়ে করতে চাই।' আমি বললুম, 'আ মোলো যা। বিয়ে করতে চাস তো তা অত ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে বলার কী আছে?'

॥ ২ ॥

সকালে ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। আমার বাবার আমলের বিশ্বস্ত দেওয়াল ঘড়িটায় এখন ন'টা বাজতে দশ।

আমার এক্ষুনি তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়ার কোনও দরকার নেই। আরও কিছুক্ষণ মটকা মেরে শুয়ে থাকতে পারি। দাদা অফিসে বেরোয় ঠিক ন'টার সময়। এখন সবাই তাকে নিয়েই ব্যস্ত, হেড অফ দ্য ফ্যামিলি বলে কথা। এখন আমি এক কাপ চা চাইলেও পাব না।

এখন দাদার মুখোমুখি না হওয়াই ভাল। আমাকে দেখলেই দাদার কিছু না-কিছু কাজের কথা মনে পড়ে। আজ বোধ হয় বাজারে যেতে হবে না। এখন মাসের শেষ, এখন রোজ বাজারে যাওয়াটাই বিলাসিতা। আজ আমার ছুটি। তবে এটা এমনই একটা ছুটি, যা আমি কিছুতেই উপভোগ করতে পারি না। যেমন বনধের দিনে রিকশাওয়ালা বা মোড়ের মাথায় যে লোকটি ডাব বিক্রি করে, তারা এই ছুটি কেরানিবাবুদের মতো উপভোগ করতে পারে। আমিও ওদের দলে, আজ আমার কোনও রোজগার নেই।

কাল রাত্তিরে বাড়ির সামনের রাস্তায় যে বিচ্ছিরি এবং ভয়ংকর নাটকের দৃশ্যটা দেখেছি, সেটা আমি সত্যিই দেখেছি না স্বপ্ন? বেশ কয়েকবার সেই দৃশ্যটা মনে এনে যাচাই করতে-করতে স্পষ্ট বুঝলাম, নাঃ ওটা স্বপ্ন নয়, কোনও স্বপ্নই অতখানি বাস্তব হতে পারে না।

প্রত্যেক মানুষই নাকি প্রতি রাতে অনেক স্বপ্ন দেখে, যাতে তার মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে, সারা দিনের বাস্তব মেনে চলার চাকাটা উলটো দিকে ঘুরিয়ে দেয়। দিনের আলো ফুটে ওঠার পর সেই সব স্বপ্ন স্মৃতি থেকে আস্তে-আস্তে মুছে যায়। তবে, কখনও যে দু'একটা স্বপ্ন মনে থেকেও যায়, তার কারণটা বোঝা যায় না। কোনও লেখক নাকি স্বপ্ন থেকে নতুন গল্পের প্লট পেয়ে যান, এ কথাও বইতে পড়েছি।

কাল একটা অতি বাজে আর অর্থহীন স্বপ্নের কথা আজ এখনও ভুলে যাইনি। আমার বন্ধু সরিতের ওই যে বিয়ে-পাগলামির স্বপ্নটা! সরিতের তো কবেই বিয়ে হয়ে গিয়েছে, অন্তত দু' বছর আগে। ওর বিয়েতে আমি বরযাত্রী ছিলাম একজন, সেই নেমন্তন্নে কাঁঠালের আমসত্ত্ব, না, না, সরি, খেজুরের আমসত্ত্ব, না, না আমেরই আমসত্ত্ব ছিল, কিন্তু বেসন দিয়ে গরম-গরম ভাজা ছিল, যা আমি আগে কখনও খাইনি। ওর স্ত্রীর নাম উপমা কিংবা কাকলি, আমার ঠিক মনে আছে। অবশ্য আট-দশ মাস ওদের সঙ্গে দেখা হয়নি, সে কথাও ঠিক।

এর মধ্যে দাদা নিশ্চয়ই বেরিয়ে গিয়েছে, ওর অফিসের গাড়ির হর্নও শুনেছি, এবার আমার ওঠা উচিত। নইলে মা দুঃখ পাবেন।

আমার মায়ের মনে একটা দুঃখ আছে। তাঁর এই সাতাশ বছরের দামড়া ছেলেটা আজও কোনও চাকরি পায়নি কিংবা চাকরি করে না। এ জন্য আত্মীয়-স্বজনদেরও খেয়েদেয়ে কাজ নেই, এই বিষয়টা একবার না-একবার তুলবেই তুলবে। বাঙালি পরিবারের অনেক গিন্নিই অন্য কাউকে একটু ঠেস দিয়ে কথা বলতে বেশ আনন্দ পায়। এক-একজনের ঠেস দেওয়ার কায়দাও অন্য রকম। যেমন, আমাদের পুতুলপিসিমা, তিনি একথা, সে কথার পর মাকে বলবেন, 'হ্যাঁ রে কনক, নিলু নাকি এতদিন একটা চাকরি পেয়েছে, খুবই আনন্দের কথা। শুনে আমার এত আনন্দ হল, মাইনেও খুব ভাল শুনেছি, তা ওর অফিসটা কোথায় রে?'

অর্থাৎ এ হল, মাকে মিথ্যে কথা বলাবার জন্য একটা টোপ দেওয়া। কিন্তু মা আমার মতো স্মার্টলি মিথ্যে কথা বলতে পারে না। তাই খানিকটা আধা মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে মিনমিন করে বলেন, 'না, এখনও পুরোপুরি পাকা হয়নি, তবে কথাবার্তা চলছে, শিগগিরই পেয়ে যাবে। ভাল কাজ!'

এর উত্তরে পুতুলপিসি বলেন, 'তা তো পাবেই। আমি রোজ ঠাকুরঘরে বসে একবার না-একবার বলি, 'ঠাকুর, আমাদের নিলুটার একটা হিল্লে করে দাও, হিল্লে করে দাও!'

এটা খুব ডিপ্লোমেটিক কথা। অর্থাৎ আমি যদি বাইচান্স একটা

AMARBOI.COM

রোজগারের উপায় পেয়ে যাই, তা হলে তিনি এসে একগাল হেসে এমন ভাব দেখাবেন, যেন পুরো কৃতিত্বটাই ওঁর। ওঁর প্রার্থনার জোরেই তো আমার হিল্লে হল। পুতুলপিসির ঠাকুরঘরের ঠাকুর হলেন শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, তাঁর একটা বড় সাইজের ছবির সামনে তিনি চোখ বুজে ধ্যান করেন। তবে, সেই মহাপুরুষের কারও চাকরিবাকরি জুটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল বলে তো কখনও শুনিনি! তা ছাড়া, আমার দৃঢ় সন্দেহ, ওটা শ্রীরামকৃষ্ণের আসল ছবি নয়। এক সময় গুরুদাস ব্যানার্জি বলে একজন সিনেমার অভিনেতা শ্রীরামকৃষ্ণের দারুণ মেকআপ নিয়ে অনেক ফিল্মে অতি নিপুণ অভিনয় করতেন শুনেছি। তার ফলে, অনেক বাঙালির বাড়িতে ওই গুরুদাসবাবুর ছবি টাঙিয়ে পুজো করা হয়। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের আসল ছবির চেয়েও একজন অভিনেতার নকল ছবি অনেক নিখুঁত।

যাইহোক, আমি যদি কোনওদিন সারাদিন বাড়িতে থাকি, শুয়ে-শুয়ে বই পড়তেই বেশ আরাম লাগে, সেই সব দিনে মা একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলে, 'সারাদিন শুয়ে থাকিস, একবার অন্তত বেরোতে পারিস না? তাতে তবু লোকে বুঝবে যে, তুই অন্তত কিছু চেষ্টা চরিত্র করছিস।'

আমি উঠে বসতেই মা এ ঘরে এসে ঢুকলেন।

হাতে কিছু ফুল আর বেলপাতা, সেই হাতটা আমার কপালে ছুঁইয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলতে লাগলেন।

আমি মায়ের অন্য হাতটা ধরে বললাম, "মা, আজ তোমাকে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে! সারা পৃথিবীতে আর কারও এত সুন্দর মা নেই।"

এটা একটা আমার পরীক্ষিত সত্য, সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই। পৃথিবীতে এমন কোনও নারী নেই, মা-শ্রেণির নারী হলেও, রূপের প্রশংসা শুনলে গোপনে খুশি হয় না। এমনকী নিজের সন্তানের কাছ থেকেও।

মা সেই খুশির ভাবটা গোপন করে, ওই বিড়বিড়ানি থামিয়ে বললেন, "আহা-হা, তোকে আর ওই সব বলতে হবে না। তুই কি এখন বাথরুমে যাবি, না আগে তোর চা-টা এখানে এনে দেব?"

আমি বললাম, "আগে চা।"

তারপরেই মনে হল, আজকের দিনটা বেশ ভালই যাবে মনে হচ্ছে। মায়ের হাসি মুখ দেখলে কার না একথা মনে হয়!

আজ একটু বাদে বাড়ি থেকে একবার বেরোতেই হবে। কোথায় যাব, তা অবশ্য ঠিক করিনি এখনও। তার আগেই ঝরনাদির চিঠিটা লিখে শেষ করতেই হবে।

চা-পান, বাথরুমে দাঁত মাজাটাজা ও অন্যান্য কাজ সেরে এসে, ঠিক করলাম, কলমটা এখনও উদ্ধার করা হয়নি। তা বলে কি আর-একটা কলম থাকবে না কোনও ড্রয়ারে?

চেয়ারে বসতেই একবার চোখ গেল নীচের দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা রীতিমতো চমক। বুককেসের তলা থেকে কলমটা বেরিয়ে এসে দাঁত বের করে ফ্যাকফেকিয়ে হাসছে।

কলমের হাসির কথা হয়তো বেশ অতিশয়োক্তি হয়ে গেল। কলম হাসলেও যে তা আমরা বুঝতে পারি না। তার কারণ কলমের দাঁত নেই, আর ওরা কখনও শব্দ বার করে না। তা বলে কোনও ব্যাপারে খুশি হলে কলম নিজে-নিজে হাসতে পারবে না কেন?

নিচু হয়ে তুলে নিলাম কলমটা।

বাবা-কাকাদের আমলে কলমকে বলা হত ফাউন্টেন পেন, আর কত রকম ভাল-ভাল নাম ছিল! বাবা আমার জন্য একটা শেফার্স কলম কিনে দিয়েছিলেন। শুনেছি, এককালে এই কলম ছিল বেশ শৌখিন আর দামি। আমি বাবার অযোগ্য পুত্র হিসেবে একদিন একটা ভিড়ের ট্রামে একজন পকেটমারের করকমলে সেটা তুলে দিতে বাধ্য হই।

ওইসব কলমের বড়-বড় অনেক কোম্পানি উঠে গিয়েছে। আর

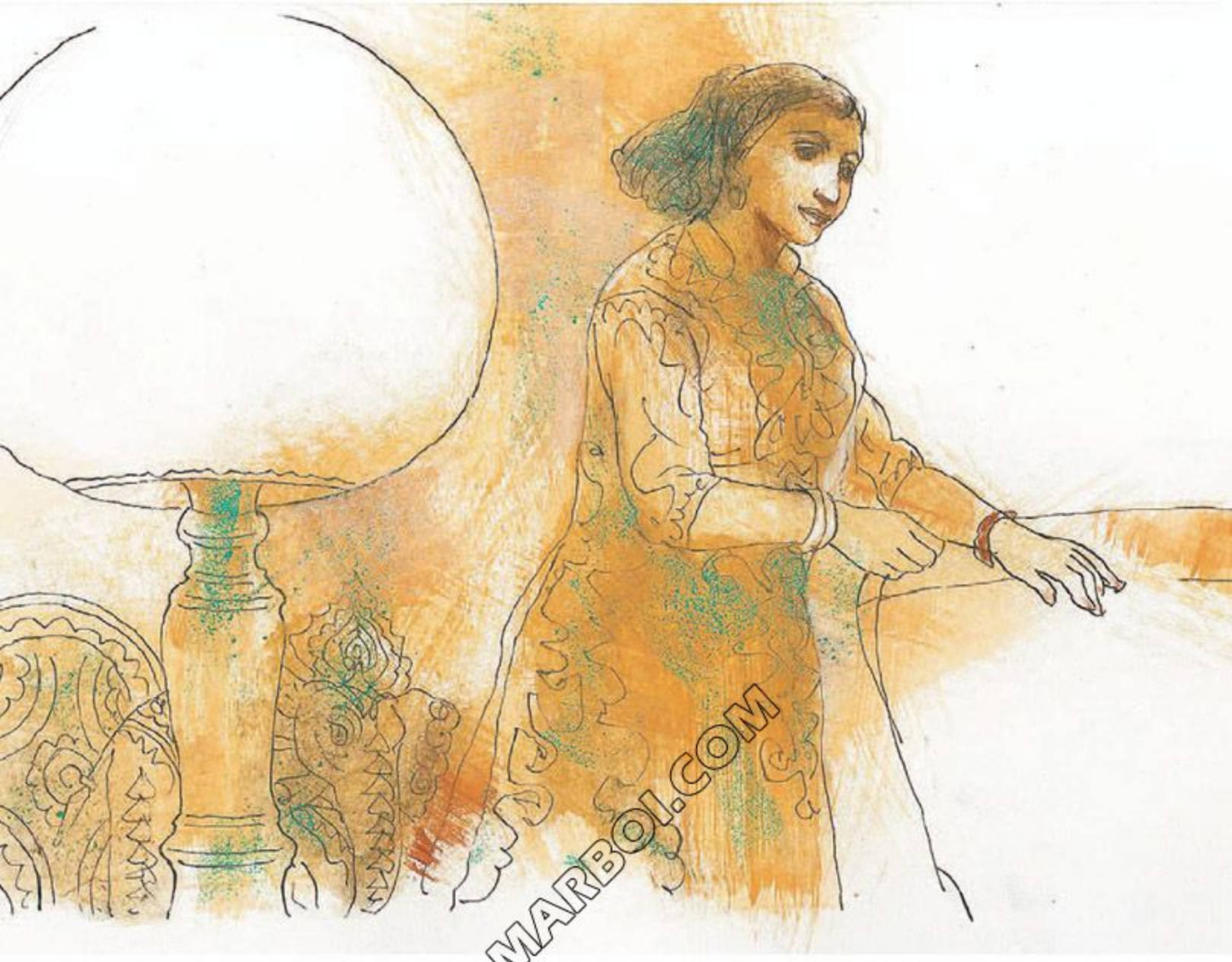

AMARBOI.COM

দু'-একটা কোম্পানি জাত খুইয়ে সস্তার মডেল বাজারে আনছে, যেমন পার্কার। বাবা বলতেন, 'পার্কার কলম, ওরে বাবা! একসময় সেরকম একটা কলম হাতে নিলেই আনন্দে বুক ভরে যেত।'

এখনকার ডট পেনগুলোর সেরকম কোনও জাত-ধর্ম নেই। কোন কোম্পানির তৈরি, তা কেউ খেয়ালও করে না। অনেকেই এই কলমের কালি ফুরিয়ে গেলে রি-ফিল না ভরে এমনিই ছুড়ে ফেলে দেয়। আমি অবশ্য এই কলমে দু'দিন আগেই রি-ফিল দিয়েছি, সুতরাং এ এখন পূর্ণ স্বাস্থ্যবান।

তাকে ছোট্ট একটা চুমু দিয়ে বললাম, "তুই নিজে-নিজে বুককেসের তলা থেকে বেরিয়ে এলি কী করে রে?"

স্পষ্ট দেখলাম, কলমটা আবার হাসছে। দুষ্টুমির হাসি।

প্যাড টেনে নিয়ে লেখা শুরু করার আগে, মনে একটা উসখুসে ভাব এল। কী যেন নেই, কী যেন নেই?

ওঃ হো, দিনের প্রথম সিগারেটটাই তো খাওয়া হয়নি। মাথায় একটু ধোঁয়া না দিলে কি লেখা বেরোয়!

সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই রাখি বাঁদিকের ড্রয়ারে। সেটা খুলে দেখলাম, প্যাকেটটা আছে, দেশলাই নেই।

আরে, দেশলাইটা গেল কোথায়? কাল রাত্তিরে এখানে রেখেছি, স্পষ্ট মনে আছে।

পুরো ড্রয়ারটা খুঁজলাম, নেই। অন্য ড্রয়ার, আর সব সম্ভাব্য জায়গা খুঁজলাম তন্নতন্ন করে, কোথাও নেই। কাল রাত্তিরে যে জামাটা খুলেছি, সেটার পকেটও খালি।

সপ্তাহখানেক ধরেই দেখছি, মাঝে-মাঝেই দেশলাই উধাও হয়ে যায়। কেন? আগে তো হত না।

আমার ভাগ্যে লাইটার সয় না। মাঝে-মাঝে কেউ উপহার দিলেও দু'তিনদিনের মধ্যে তা হারিয়ে ফেলতে সক্ষম হই। অনেক সময় অন্য কেউ নিয়ে নেয়, তাও পরে চিন্তা করে দেখেছি। না, না, সামান্য একটা লাইটার আমার চেনা শুনে কেউ চুরি করবে, তা ভাবি না। অন্য কেউ সেটা ব্যবহার করার পর অন্যমনস্কভাবে, নিজের পকেটে রেখে দেয়, এরকম তো হতেই পারে। আমার দেশলাইই ভরসা।

তা হলে ইদানীং দেশলাই যে আমার সঙ্গে এই লুকোচুরির খেলা চালাচ্ছে, তার কারণ কি এই যে, দেশলাই চায় না, আমি বেশি-বেশি ধূমপান করি। ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, এ কথা কে না জানে? এখন দেশলাইয়ের প্যাকেটে ভয়াবহ ছবি ছাপা হয়। একজন নামী শিল্পী তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, ওইসব ছবিতে উলটো ফলও হতে পারে। যুবা বয়সে অনেকেরই একটা তেড়িয়া ভাব থাকে, সে বলতে পারে, আমি ক্যানসারে মরব না গাড়ি চাপা পড়ে মরব, তা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে কে বলেছে। আর অতই যদি মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য দরদ, তা হলে সারা দেশে সিগারেট বিক্রি নিষিদ্ধ করছ না কেন? উঁহু! জানি, জানি, সিগারেট বিক্রি থেকে এত বেশি কর আদায় হয়, সেটা কিছুতেই ছাড়তে রাজি নয় পৃথিবীর কোনও দেশের সরকার। এমনকী আমেরিকা তাই না? সিগারেট কোম্পানিগুলো খুব বড়লোক, তারা রাজনৈতিক দলগুলোকে চাঁদা দেয়, তা নিতেও কারও বিবেকে বাধে না।

AMARBOI.COM

যাক গে, ওসব তত্ত্ব কথার দরকার নেই, একবার যদি সিগারেটের কথা মনে হয়, তা হলে একটা অন্তত না-টানতে পারলে কিছুতেই ছটফটানি যায় না। এক লাইনই না লিখে আমি একটুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। খুব অভিমান হল! কার সম্পর্কে অভিমান, তা জানি না।

রান্নাঘরে একটা দেশলাই আছে নিশ্চয়ই। টুক করে সেটা একবার নিয়ে আসা যেতে পারে।

আমি মা কিংবা দাদার সামনে সিগারেট টানি না। বাড়িতে থাকলে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে নিতে হয়। যদিও সবাই আমার এই দোষের কথা জানে। তবু...

বাইরে এসে দেখি, রান্নাঘরে খুব ছ্যাঁকছ্যাঁকানি হচ্ছে। এখন একজন পার্টটাইম রাঁধুনি আসে, মা আর নিজের হাতে সব রান্না করে না, তবে সেই রাঁধুনিকে নানারকম নির্দেশ দেন। মা এখন রান্নাঘরে না বাথরুমে, তা জানি না। তবে, রান্নাঘরে ঢুকে আমি আর-এক কাপ চায়ের জন্য অনুরোধ তো করতেই পারি। সেই সময়ই দেশলাইটা হাত সাফাই।

দাদার ঘর থেকে আমাদের পুরনো কাজের মেয়ে শেফালি বেরিয়ে এসে বলল, "ও দাদা, তোমার একটা ফোন এসেছে। তোমায় ডাকছে।"

দাদা অফিসে চলে গিয়েছে, বউদিও একটা স্কুলে পড়াতে যায়, ও ঘর এখন ফাঁকা। টেলিফোনটা ব্যবহার করার কোনও বাধা নেই।

সে ঘরে ঢুকেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম। দাদার ওই ঘরের এক কোণে আছে কম্পিউটার, সেখানে বসে আছে দাদা, গম্ভীরভাবে নিমগ্ন।

আসলে আমার দাদাকে ভয় পাওয়ার কোনও কারণই নেই। দাদা মানুষটা খারাপ নয়, আমাকে ভালও বাসে, তা আমি জানি। তবে, কিছু-কিছু মানুষের ভালবাসার প্রকাশ হয় কাঠখোট্টা ধরনের। মনে হয় যেন সব সময় বকাবকির মুডে থাকে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "দাদা, তুমি আজ অফিসে গেলে না? শরীর খারাপ?"

দাদা আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, "তুই আগে ফোনটা ধর, তারপর বলছি।"

আমি 'হ্যালো' বলতেই ওপাশে ঝরনাদির গলা।

বেশ ধমকের সুরে ঝরনাদি বলল, "অ্যাই মিনু, তোকে যে আমি একটা চিঠি দিয়েছি, তার উত্তর দিলি না কেন?"

আমি বললাম, "কে? ও তুমি, ঝরনাদি? কেমন আছ?"

ঝরনাদি, "তুই বুঝি আমার গলা শুনে চিনতে পারিস না? আমার চিঠি..."

আমি বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, নাটকটা খুব ভাল হয়েছে, শুনেছি। আমার এখনও দেখা হয়নি।"

ঝরনাদি বলল, "নাটক? কীসের নাটক? আমার চিঠিতে..."

আমি বললাম, "তুমি চিঠিতে পাওনি? আমার এক বন্ধু ওতে পার্ট করেছে। ওকে বললে বোধ হয়..."

ঝরনাদি বলল, "এসব কী ন্যাকামি হচ্ছে, নিলু? আমার জরুরি কাজের কথা..."

আমি বললাম, "না, না, টিকিটের দামের কথা চিন্তা কোরো না।

যদি পেয়ে যাই, তা বলে পরে দাম দিলেও চলবে। তুমি কবে যেতে চাও, বলো?"

ঝরনাদি বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুই শুনতে পাচ্ছিস না আমার কথা? তোদের বাড়ি আমার যাওয়ার কথা এই শনিবার..."

আমি বললাম, "হ্যাঁ, দাদা-বউদি আর মা সবাই ভাল আছে। অরিজিৎদা এখন কোথায়, কলকাতার বাইরে।

ঝরনাদি বলল, "নিলু, নিলু, নিলু..."

আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, দাদা কম্পিউটার ছেড়ে উঠে গিয়ে আলমারিতে কী যেন খুঁজছে।

আমি রিসিভারের মুখ অর্ধেকটা চাপ দিয়ে ফিসফিস করে বললাম, "ঝরনাদি, এখন বেশি কথা বলার অসুবিধে আছে। তুমি আমাদের বাড়ি এই শনিবার এসো না।"

ঝরনাদি বলল, "কেন, আসব না কেন?"

আমি বললাম, "ইয়ে, মানে, এই শনিবার আমি থাকব না।"

ঝরনাদি: তুই না থাকলে কী হয়েছে? আমি তো মাসিমার সঙ্গেই কথা বলতে চাই। তার আগে তোর কাছ থেকে জানতে চেয়েছি।

আমি: পরে সব তোমায় বুঝিয়ে বলব। মা'র সঙ্গে তোমার দেখা করা এখন একেবারেই উচিত নয়।

ঝরনাদি বলল, "নিলু, তুই কী বলছিস?"

আমি বললাম, "পরে, পরে কথা হবে।"

আমি লাইন কেটে দিলাম।

দাদা আলমারি থেকে একটা বই নিয়ে ফিরে আসতে আসতে মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, "তোর গার্ল ফ্রেন্ড হয়েছে বুঝি!"

আমি বললাম, "গার্ল ফ্রেন্ড! এ তো আমার বন্ধু রূপমের দিদি। অহনাদি! আমাকে বলছে, একটা নাটকের টিকিট জোগাড় করে দিতে। দারুণ কৃপণ, ভাবছে যদি বিনা পয়সায় টিকিট পাওয়া যায়।"

দাদা চেয়ারে এসে বসল, "তুই জিজ্ঞেস করছিলি, আমার শরীর খারাপ কি না? না, সেসব কিছু না। আমাদের অফিসে নতুন নিয়ম হয়েছে, প্রত্যেকদিন অতখানি গাড়িতে তেল পুড়িয়ে অফিসে যাওয়ার দরকার নেই। কিছু কিছু কাজ বাড়িতে বসে কম্পিউটারেই করা যায়। তুই একটু আধটু কম্পিউটারের কাজ শিখেছিস নাকি?"

আমি বললাম, "দাদা, আমি তোমার ওই মেশিনে কক্ষনও হাত দিই না। বউদিকে জিজ্ঞেস করো।"

দাদা বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। একটা ছুটির দিনে তোকে নিয়ে বসব। আমার কম্পিউটারে তুই হাত দিবি না কেন? একটু আধটু শিখে নিলে সবাই ব্যবহার করতে পারে। শোন নীলু, তুই আমার একটা কাজ করে দিতে পারবি? তা হলে খুব ভাল হয়।"

আজকের দিনটা সত্যিই খুব সুন্দর। দাদা তো হুকুম করেই বলতে পারত, 'আজ তোকে একটা কাজ করতে হবে। তার বদলে, আজ তুই আমার একটা কাজ করে দিতে পারবি?' কত মধুর শোনাল।

আমি বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী কাজ বলো।"

দাদা বলল, "তুই আমার বন্ধু পিনাকেশকে তো চিনিস? ঠাকুর পুকুরে ওর বাড়ি, ওর এক বোনের বিয়েতে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই গিয়েছিলাম, তাই না?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ মনে আছে। পিনাকেশদাকে পরেও দু' একবার দেখেছি।"

দাদা বলল, "পিনাকেশের জ্বর হয়েছে, চিকুনগুনিয়া না কী যেন বলে, তাও হতে পারে। বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না। ওর কাছে আমার জন্য একটা প্যাকেট রেখে গিয়েছে একজন এজেন্ট। সেটা আমার পাওয়া দরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, অথচ আমিও সময় করে যেতে পারছি না। তুই সেটা নিয়ে আসতে পারবি?"

আমি বললাম, "পারব না কেন? একটু বাদেই যাচ্ছি।"

দাদা বলল, "না, না, এখন না, বিকেলের দিকে গেলেই চলবে। সন্ধে হলে আরও সেফ। প্যাকেটটা কেউ দেখতে চাইলে দেখাবি না। তুইও খুলিস না। তোর ট্রাম-বাসের ভাড়া বউদির কাছ থেকে চেয়ে নিস।"

এক-একদিন পরপর ভাল ঘটনাই ঘটতে থাকে। ঝরনাদিকে আর চিঠি লেখার দরকার নেই। ও ব্যাপারটা চুকে গেল। আর, দাদা যে আমাকে একটা কাজের জন্য পাঠাতে চাইছে, সেখানেই তো থাকে আমার সেই বন্ধুটা, যাকে নিয়ে কাল রাতে আমি একটা উদ্ভট স্বপ্ন দেখেছি।

আমার আর আলাদা গাড়ি ভাড়া লাগল না, দাদার কাজটা সারার পর ওর বাড়িতে একটা ঘুরলা দিয়ে আসতে পারি।

ঘুরলা কথাটার মানে হয়তো অনেকে বুঝবে না। বাঙালরা খুব বলে। আমার মেজো মামা তো একবার না-একবার বলবেনই। খুব সম্ভবত এর মানে, কোনও চেনা বাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য ঘুরে যাওয়া, অনেক সময় বিনা কারণেই। ঘুরলা কিংবা ঘুল্লা।

রান্নাঘরে মা আর রাঁধুনিদিদি একসঙ্গে কিছু একটা রান্না করছে এখন ওখানে গিয়ে আর চায়ের কথা বলা যাবে না, দেশলাইটা সরানোও দুষ্কিকট্ট হবে। ঠিক আছে, আর একটু পরে একবার!

এখন যদি দেখি, আমার ড্রয়ারে দেশলাইটা ফিরে এসেছে, তা হলে সেটাই একটা অলৌকিক ব্যাপার বলতেই হবে। বুককেসের তলা থেকে কলমটা বেরিয়ে আসা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। একটা টিকটিকি কিংবা টিকটিকি ধাক্কা দিতে পারে কিংবা প্রবল হাওয়া, কিন্তু একটা বন্ধ ড্রয়ার থেকে একটা দেশলাইয়ের উধাও হয়ে যাওয়া, আবার ফিরে আসা মোটেই সম্ভব নয়।

তবু আমি পরে ঢুকেই ড্রয়ারটা খুলে দেখলাম। না, দেশলাইটা সেখানে নেই। যাক বাঁচা গেল! এখন শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়া যেতেই পারে।

বিছানায় গড়াতে না-গড়াতেই দেখতে পেলাম, জানলার হাফ পরদাটা একটু-একটু বাতাসে দুলছে, আর সেখানেই দেখা যাচ্ছে আমার শ্রীমান দেশলাইকে।

বন্ধ ড্রয়ার থেকে ও নিজে-নিজে তো বেরিয়ে জানলার বেদিতে গিয়ে বসতে পারে না। ও কথা আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না। এক হতে পারে, কাল রাত্রে শেষ সিগারেটটা ধরাবার পর প্যাকেটটা ড্রয়ারে রেখে দেশলাইটা হাতে রেখেছিলাম কিছুক্ষণ। তারপর অন্যমনস্ক ভাবে জানলার ওখানটায় রেখেছি। কিছুক্ষণ আগে অত খোঁজাখুঁজির সময় ওকে দেখতে পাইনি, কারণ পরদার আড়ালে ছিল। এরকম হয়, কোনও একটা জিনিস একেবারে চোখের সামনে থাকলেও খোঁজাখুঁজির সময় সেটার দিকে নজর পড়ে না।

প্রথমেই দেশলাইটাকে দেখতে পেলে এতক্ষণে দু'তিনটে সিগারেট ফোঁকা হয়ে যেত। দেশলাইটা পরদার আড়ালে থেকে কি আমার ওই দু'তিনটের বিষ কমিয়ে দিল? এটা আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

একটা সিগারেট দু'আঙুলের ফাঁকে রেখে দেশলাইটার দিকে চেয়ে রইলাম। না জ্বালিয়ে। দেখা যাক, এই ভাবে কতক্ষণ পারা যায়।

এখন মাত্র এক টাকায় ষাটখানা কাঠি সমেত একটা দেশলাই কেনা যায়। তা বলে প্রমিথিউসের কষ্টকর সাধনার মূল্য একটুও কমেনি।

কে যেন লিখেছিলেন এই কথাটা।

দুপুর পর্যন্ত আমি একটাও সিগারেট না ধরিয়ে দিব্যি থাকতে পারলাম। নিজের কাছেই এই সংযমের পরীক্ষা। প্রায় অবিশ্বাস্য

AMARBOI.COM

হলেও এটা একেবারে সত্যি কথা।

॥ ৩ ॥

আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে ট্রাম-বাস ধরার জন্য মাত্র তিন মিনিট হাঁটতে হয়। সোজা রাস্তা। তবু কেন আমি সে পথে না গিয়ে পাশের সরু রাস্তাটায় ঢুকে পড়লাম!

এরকম অন্য রাস্তায় যাওয়ার কথা আমি একবারও ভাবিনি। অনেক সময় নিজের ইচ্ছেটাও বোঝা যায় না। আসলে অবচেতন নামে একটা বস্তু থাকে প্রত্যেক মানুষের মনে। সেই অবচেতনের এতই শক্তি যে, অনেক সময় নিজের দেহধারীকেই নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়।

এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে আমি মনে-মনে প্রশ্ন করলাম, "ওগো অবচেতন, তুমি আমাকে এই রাস্তায় কেন নিয়ে এলে বলো তো?"

উত্তর দেওয়ার বদলে সে ফিসফিস করে হাসতে লাগল।

তখনই আমার মনে পড়ে গেল আসল কারণটা।

কাল রাত্তিরে যে-দৃশ্যটা আমি দেখেছি, তাতে সেই মহিলাটি পুলিশ আসতে দেখে এই গলিতে দৌড়ে ঢুকে পড়েছি। এখানেই খুব সম্ভবত তাঁর বাড়ি। এখানেই ট্যাক্সিটা থেমেছিল। মহিলাটি কি কল গার্ল, না কোনও বড় কোম্পানির কর্মী, যাদের কোনও বাঁধা ধরা অফিস আওয়ার্স থাকে না। অত রাতে তিনি কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে ট্যাক্সিতে এসে, এখানে নেমে ট্যাক্সির অন্য যাত্রীদের নমস্কারও জানিয়েছেন, আবার সেই ট্যাক্সিরই দু'জন পুরুষ এখানে তাঁকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে, ব্যাপারটার মধ্যে বেশ একটা রহস্যের গন্ধ আছে না? আর এ কথা কে না জানে, আমাদের এই শ্রীমান বা শ্রীমতী অবচেতন রহস্যকাহিনী বড্ড ভালবাসে।

এই গলিতে এসে পড়েছি, যদি সেই রহস্যময়ীকে একবার দেখা যায়। কিংবা পরিচয় জানতে পারি। কিন্তু আমি তো সেই মহিলার মুখটাও ভাল করে দেখতে পাইনি। তাঁকে দেখলেও চিনব কী করে?

"ধ্যাৎ," বলে আমি অবচেতন মনকে একটা ধাক্কা দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আবার।

এই সব অপ্রশস্ত রাস্তায় এখন একটা পাড়া-পাড়া ভাব আছে। সবাই সবাইকে চেনে। এক জায়গায় দেখলাম, রাস্তার দু' পাশের দু'টো বাড়ির বারান্দায় দু'জন মহিলা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। এদের দু'জনের মধ্যে একজন কি হতে পারেন কাল রাত্তিরের সেই রহস্যময়ী?

তা বলে কি দুই মহিলার কথা শোনার জন্য কি রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়া যায়? সেটা চূড়ান্ত অসভ্যতা। তবে, জুতোর ফিতে বাঁধার ছল করে আধ মিনিট সময় হরণ করা যেতে পারে।

মহিলারা কথা বলছেন, আলু ও বেগুনের মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে। যাচ্চলে! এই সব কথা শোনার কোনও মানেই হয় না। তবে, একটা বিষয় জানা গেল, আমাদের এ পাড়ার বাজারের চেয়ে রামলাল বাজারে আলু অন্তত দু' টাকা কম। রামলাল বাজারটা যে কোথায়, তাও আমি জানি না।

দাদার বন্ধুর নাম পিনাকেশ। এ নামের মানে কী? আজকাল এই একটা বাতিক হয়েছে আমার, অনেক বাংলা শব্দ আমরা ব্যবহার করি, অথচ মানে জানি না, সে রকম কোনও শব্দ শুনলেই তার মানে জানার জন্য মনটা খচখচ করে। পিনাকেশ, খুব সম্ভবত শিবের একটা নাম, তবু ডিকশনারিতে একবার চেক করে নিতে হবে।

পিনাকেশদা যে প্যাকেটটা দেবে, সেটা খুব গোপন ব্যাপার। অন্য কাউকে দেখানো চলবে না। এমনকী আমারও খুলে দেখার অধিকার নেই। আবার রহস্য। ওই প্যাকেটটায় বোমা-টোমা আছে

AMARBOI.COM

নাকি? চলন্ত ট্রামের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে এই কথাটা ভাবতেই আমার হাসি পেয়ে গেল। বোমার কারবার করবে আমার কেরিয়ারিস্ট দাদা? রাজনীতির সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই, ওসব সাতে-পাঁচে সে মাথাই গলাতে চায় না।

পিনাকেশদার বাড়িতে আগে যাব না সরিতের বাড়ি ঘুরে, তারপর?

পুলিশের চাকরি করে সরিৎ। কখন কী ডিউটি করে তা জানি না। বিয়ে করার পর সেই বিবাহিত বন্ধুর সঙ্গে অবিবাহিত বন্ধুদের কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয়েই যায়। সরিতের সঙ্গে বেশ কিছুদিন দেখাও হয়নি, কোনও কথা হয়নি। তবু তাকে নিয়ে ওই বিদঘুটে স্বপ্নটা...

এই রে, সরিতের স্ত্রীর নামটা কী যেন। একবার মনে হচ্ছে উপমা, আবার মনে হচ্ছে কাকলি। ওকে কোন নাম ধরে ডাকব? নামের ভুল করা কেউ-ই পছন্দ করে না। কিছুক্ষণ ভাববাচ্য চালিয়ে যেতে হবে।

ওদের বাড়িতে কি কিছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত? আজ মোটামুটি আমার পকেটে কিছু পয়সাকড়ি আছে। ট্রাম থেকে নেমে হাঁটতে-হাঁটতে দেখলাম, এক জায়গায় বাদাম ভাজা হচ্ছে। বাঃ, এই বাদামই তো বেশ ভাল উপহার হতে পারে। কিনে ফেললাম এক ঠোঙা।

সরিতের বউ আমায় দেখামাত্র চিনতে পারল, আমার নামও মনে রেখেছে। দরজা খুলে আমাকে দেখেই বলল, "আসুন, আসুন নিলুদা। আপনার বন্ধু তো আজ সকালেই আপনার কথা বলছিল। কী যেন একটা দরকার আছে।"

আবার একটা চমক। আজই আমার কথা মনে করেছে সরিৎ? আমার সঙ্গে ওর কী-ই বা দরকার থাকতে পারে?

বসার ঘরটি বেশ সুন্দর ভাবে সাজানো। চোখধাঁধানো নয়, বরং বেশ রুচিসম্মত। কয়েকটি চেয়ার আর-একটি সোফাসেট। দেওয়ালে যথারীতি রবীন্দ্রনাথ আর যামিনী রায়ের ছবির প্রিন্ট বাঁধানো। একটা সরু ফুলদানিতে একটিমাত্র গোলাপ গলা উঁচিয়ে আছে।

ওর হাতে বাদামের ঠোঙাটা এগিয়ে দিতেই ও বেশ খুশির সঙ্গে বলল, "বাদাম? আমি আর আমার বোন দু'জনেই বাদাম খুব ভালবাসি। বাড়িতে এখন স্টক নেই।"

তারপর আবার সে বলল, "ওই সোফাটায় বসুন। আর কী খাবেন বলুন। চা, কফি, কিংবা মদ খেতে চান? রাম আর হুইস্কি দু'টোই আছে।"

চমকের পর চমক।

বিকেল এখনও শেষ হয়নি। এরই মধ্যে এক মহিলা মদ্যপানের প্রস্তাব দেবেন, এ আমার অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে।

আমি মাথা নিচু করে বললাম, "না, ওসব কিছু না। আমার এক কাপ চা পেলেই চলবে। সরিৎ বাড়িতে নেই বুঝি!"

বউটি বলল, "বাড়িতে নেই, তবে ফেরার সময় হয়ে গিয়েছে। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে।"

তারপরই চেঁচিয়ে ডাকল, "এই রুনি, রুনি। একবার এদিকে আয় তো।"

তক্ষুনি একটি মহিলা এ ঘরে এল।

তাকে দেখেই দ্রুত হয়ে গেল আমার হৃৎস্পন্দন।

মহিলাটি খুব সুশ্রী তো বটেই, তার মুখের সঙ্গে আর একজনের আশ্চর্য মিল।

সরিতের বউ বলল, "এ আমার আর-এক বোন, এর নাম প্রথমা। মাঝে-মাঝে আমাদের কাছে কয়েকটা দিন থেকে যায়। আমাদের বাপের বাড়ি তো জামসেদপুরে। রুনি, তুই একে চিনিস? তোর দুলাভাইয়ের মুখে তো নীললোহিতের অনেক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প শুনেছিস। এই সেই স্বনামধন্য।"

অ্যাডভেঞ্চার শব্দটির অনেক রকম অর্থ হয়। সুতরাং মেনে নিতে পারা যায়।

আমি তাকে হাত জোড় করে নমস্কার জানাতেই সে বলল, "ওরে বাবা, এ তো দারুণ ব্যাপার। আজ সারা দিনটাই এমন সব ঘটছে, আপনি একটু বসুন প্লিজ, আমি চট করে একটা কাজ সেরে নিয়ে আসছি, আপনার কাছে আরও অনেক গল্প শুনব।"

আমি এর মধ্যেই একটা ক্লু পেয়ে গিয়েছি। প্রথমার বোনের নাম, কাকলির বদলে উপমা হওয়াই যুক্তি সঙ্গত। তবু খানিকটা সাবধানতার সঙ্গে সরিতের স্ত্রীকে বললাম, "তোমাদের দুই বোনের নামেও মিল, চেহারাতেও মিল আছে।"

ও বলল, "হ্যাঁ, আমার ঠাকুরমা মিলিয়ে-মিলিয়ে নাম রাখতেন। ওর নাম প্রথমা, আমার নাম সুরঙ্গমা।"

যাচ্চলে! ওর দু'টোই ভুল নাম আমি এতদিন মনে-মনে পুষে রেখেছি?

সুরঙ্গমা বলল, "ওর সঙ্গে আমার চেহারার মিল কোথায়? আমি দিন-দিন মোটা হয়ে যাচ্ছি।"

কোনও মেয়ের এই আক্ষেপ শুনে কক্ষনো সায় দিতে নেই, তা আমি জানি ভাল করেই। আমি গভীর বিস্ময়ের ভান করে বললাম, "তুমি মোটা? তা হলে পৃথিবীর সব মেয়েদেরই এরকম মোটা হওয়া উচিত। আমি তো তোমাকে দেখছি, পারফেক্ট ফিগার।

সুরঙ্গমা এ কথার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাল না, চাপা বিষাদের সঙ্গে বলল, "বিয়ের সময় আমি অনেক রোগা ছিলাম। আপনার বন্ধু জোর করে খাইয়ে-খাইয়ে..."

কথা শেষ না করেই সুরঙ্গমা চলে গেল ভিতরের ঘরে।

কয়েক মিনিট পরেই প্রথমা এল আমার জন্য চায়ের কাপ নিয়ে। কাপটা সাইড টেবিলে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কখনও চাইবাসা গিয়েছেন?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, দু'-তিনবার। জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগে।"

প্রথমা বলল, "আমি তো বেশির ভাগ সময়ে জামসেদপুরেই থাকি, ওখানে যাই মাঝে-মাঝে। চাইবাসা আমার পছন্দের জায়গা, শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া।"

আমি বললাম, "কী সেটা?"

প্রথমা বললাম, "স্টেশনের কাছেই একটা কুয়ো খোঁড়া হচ্ছে। এর পর জায়গাটা জল-কাদায় বিশ্রী হয়ে যাবে। স্বর্ণপ্রভা আর ঘেন্নায় ওদিকে যাবেই না।"

আমি বললাম, "স্বর্ণপ্রভা কে?"

প্রথমা বলল, "আমাদের আর-এক বোন। আমাদের সবার মধ্যে সে-ই বেশি গুণী। সেই-ই তো আপনার উপর নজর রাখার

AMARBOI.COM

ভার নিয়েছে।

আমি আঁতকে ওঠে বললাম, "আমার উপর নজর... মানে, আমি কি কোনও ক্রিমিনাল নাকি? আমার সেরকম কোনও যোগ্যতা আছে?"

প্রথমা একটু হেসে বলল, "তা আমি জানি না। সেসব দিদিই আপনাকে বলবে।"

আমি বললাম, "তুমি একটু বসবে। আমার দু'-একটা প্রশ্ন আছে, অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে।"

প্রথমা বলল, "ও মা, আপত্তি থাকবে কেন? আপনার সঙ্গে গল্প করতেই চাই। আপনি কোনও খারাপ কথা বলবেন না, তাও আমি জানি। আমাকে আর একবার ভিতরে যেতে হবে। এর মধ্যে আপনি চা খেয়ে নিন। আমি আসছি আবার ফিরে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে।"

সে চলে গেল ভিতরে। আবার আমি একা।

কয়েক দিন ধরে আমাদের বাড়িতে একটা ব্যাপার নিয়ে খুব তোলপাড় চলছে, একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপারে। আমাদের পরিবার মোটামুটি নির্ঝঞ্ঝাটে থাকে, এমনকী শাশুড়ি আর পুত্রবধূর মধ্যে, টি ভি সিরিয়ালের মতন, কোনও অশান্তির গন্ধ নেই।

এরই মধ্যে কোনও এক মহিলা আমাদের পরিবারের খুব শুভার্থী সেজে আমার মাকে টেলিফোনে জানিয়েছে, আমার বউদি নাকি সকালবেলা স্কুলে পড়ানোর নাম করে বাড়ি থেকে বেরোয়। কিন্তু মাঝে-মাঝেই স্কুলে যায় না, তখন সে একজন লোকের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করে। এই তো গত বেস্পতিবারই নিউ আলিপুরের এক রেস্তরাঁয় দেখা গিয়েছে, সকাল ন'টা বেজে এগারো মিনিটে ওরা একটা পরদা ফেলা ক্যাবিনে বসে ফিসফিস করে কী সব কথা বলছিল অনেকক্ষণ ধরে।

আবার সেই মহিলাই ঝরনাদির শ্বশুরকে ফোনে বলেছে, মাঝে-মাঝেই আপনার ছেলে দেরি করে ফেরে, তখন সে কোথায় যায় তা জানেন? মোটেই সে অফিসে ওভার টাইম খাটে না। তখন সে গঙ্গার ধারে একজন নষ্ট মেয়েমানুষের হাত ধরে ঘোরে, এক-একদিন সে সেই মেয়েমানুষের ঘরেও যায়। এখুনি ছেলেটাকে আটকান, নইলে বড় রকম বিপদ হয়ে যেতে পারে।

দু'টো জায়গাতেই মহিলা নিজের নাম জানাননি, যদিও কথা বলছিলেন আপনজনের মতো।

এই সব নাম গোপন করা অভিযোগকারী বা কারিণীরা সমাজের বিষফোড়ার মতন। এক-একটা পরিবারের মধ্যে এই সব গুজব ছড়িয়ে কত যে ক্ষতি করে, এমনকী কেউ হঠাৎ আত্মঘাতী হয়েও যায়। তাতে ওদের কী লাভ? কে যেন খবরের কাগজে লিখেছে যে, এ হচ্ছে নিষ্কাম ঈর্ষা। নিজেদের কোনও লাভ থাকুক বা না থাকুক, তবু বিষ ছড়াই, তাতেই আনন্দ হয় তাদের।

ঝরনাদিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অনেকটাই কাছাকাছি। দু' দিকেই যাওয়া-আসা আছে। মাঝে-মাঝে নেমন্তন্নও খেয়েছি, বিশেষত ঝরনাদির রান্না দই-মাছ অতি উপাদেয়।

এই সব গুজব হেসে উড়িয়ে দেওয়াই উচিত। প্রথম দিকে তাই-ই হয়েছিল, কিন্তু কথায় কথা গড়ায়।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক, তাহারও বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে। প্রথম দিকের ঠাট্টা-ইয়ার্কি ক্রমশই তিক্ততার দিকে যায়। এখন বোঝা গেল, মা আসলে ঝরনাদিকে কোনওদিনই পছন্দ করে না, তার প্রধান দোষ দেখানেপনায়। আর ঝরনাদির ধারণা, এসবই মিথ্যে। তবু গুজব ছড়ানোর মূলে আছে আমার বউদি। এখন দুই পরিবারের মধ্যেই পারস্পরিক দোষারোপ চলছে। এতে আমার কোনও ভূমিকা নেই, আমার কথা কেউ গ্রাহ্যই করবে না। তবু মাঝে-মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে আমার বলতে ইচ্ছে করে, উঃ বাবা রে বাবা, তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এইভাবে ছাই চাপা দিচ্ছ কেন? আমার বউদি যদি কোনও একজন চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হলে কাছাকাছি একটা দোকানে বসে চা খেয়ে গল্প করে, তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? বিবাহিত মহিলাদের কি এতটুকু স্বাধীনতাও থাকবে না?

বউদি যদিও বলেছে যে অন্তত এক বছরের মধ্যে কোনও চায়ের দোকানে যায়নি, একা কিংবা কারও সঙ্গে। আলিপুরের কোনও চায়ের দোকান চেনেই না। তবু আমি এর মধ্যে একদিন উক্ত চায়ের দোকানটি খুঁজে পেয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে এসেছি। সেই দোকানটায় কোনও কেবিনই নেই, বাইরে প্রকাশ্যে টেবিল চেয়ার। অথচ সেই কণ্টকটি নাকি নিজের চোখে দেখেছে যে, সেখানে এক পরদা ফেলা কেবিনে কারও সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছে, ঠিক ক'টা বেজে ক'মিনিটে!

দুই পরিবারের পারস্পরিক দোষারোপ যখন তুঙ্গে, তখনই ঝরনাদি আমাকে চিঠি লিখে (আমাদের বাড়ির টেলিফোনটা দাদার ঘরে থাকে, তা সে জানে) জানতে চাইল, আমার মায়ের কী কী অভিযোগ আছে তার সম্পর্কে, তা হলে সব বুঝিয়ে বলে মিটমাট করে নিতে চায়। সে মায়ের পা ধরে ক্ষমা চাইতেও রাজি।

কিন্তু সেটা মোটেই এই অবস্থায় ঠিক হবে না। মা এখনও রেগে আগুন হয়ে আছেন। আমার মা? বেশ জেদি ধরনের, একবার কিছু মাথায় ঢুকলে সহজে যেতে চায় না। ঝরনাদিকে দেখলেই মা এখন প্রথমেই হয়তো অপমান করে বসবে। তাই আমি বলতে চেয়েছিলাম, এখন না, এখন না, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলে ব্যাপারটা অনেক তরল হয়ে যাবে। সময়ই তো মানুষের অনেক রকম অসুখ সারিয়ে দেয়।

প্রথমা ফিরে এসে বসতে না-বসতেই ফস করে একটা সিগারেট

(Govt. Regd.)
ASTHA HOLIDAYS
come on . . . let's go !!
SERVICE
Package Tours
Air Ticketing
All India Hotel Booking
Corporate Package
Tailor Made Package
Weekend Tours
Honeymoon Package
School & College Excursion Tours
Any Day as per your choice Plan your Holidays in our Own Hotel at Delhi, Dooars & Portblair.
Ph. 03365411230, 9038085775
www.asthaholidays.co.in

ধরাল।

মেয়েদের সিগারেট টানা দেখতে আমার বেশ ভাল লাগে। সিগারেট টানা যদি খুব দোষেরই হয়, তা হলে তা সম্পূর্ণ বর্জন করার দায়িত্ব নারী ও পুরুষের সমান। আর যদি ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে ক্যানসারে মরতে চায়, তা হলেও পুরুষ ও নারী থাকতে পারে পাশাপাশি। এখন তো দেখি, পুরুষদের চেয়ে মেয়েরাই এগিয়ে আছে কয়েক পা।

নিজেরটা বাঁচাবার জন্য আমি প্রথমাকে বললাম, "তুমি কী সিগারেট খাচ্ছ দেখি? একটা নিতে পারি?"

সে প্যাকেটটা এগিয়ে দিল আমার দিকে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি জামসেদপুরেও সিগারেট খাওয়ার সুযোগ পাও? কোনও অসুবিধে হয় না?"

প্রথমা বলল, "আপনি আমাকে কী সব দরকারি প্রশ্ন করবেন বলেছিলেন?"

আমি বললাম, "ও হ্যাঁ। সেরকম কিছু দরকারি নয়। তুমি কি আমার দাদা-বউদিকে চেনো?"

ঝরনা বলল, "আপনার দাদা-বউদি, না তো? আপনাকেও তো আমি এই প্রথম দেখলাম। ওদের চেনা না চেনায়..."

আমি বললাম, "না, না, অমনিই। আসলে তোমার সঙ্গে আমার বউদির চেহারার খুব মিল। বিশেষত নাকে, দু'জনের ঠিক একই রকম নাক।"

ঝরনা বলল, "নাকের মিল?"

আমি বললাম, "আরও অনেক মিল আছে। এমনকী, তোমরা

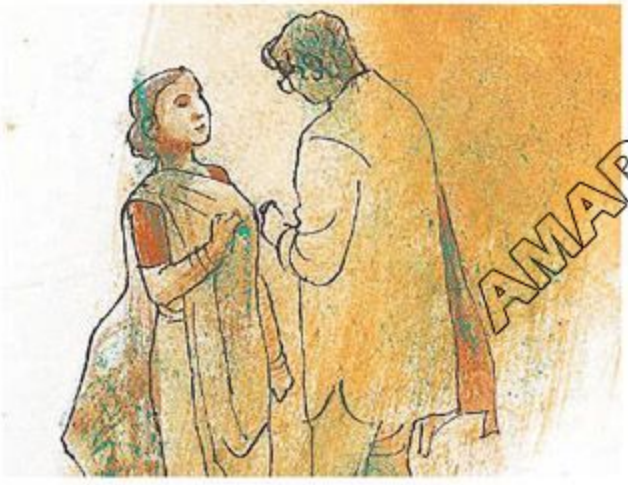

যমজ বোন বললেও কেউ অবিশ্বাস করবে না।"

ঝরনা বলল, "এতটাই? তা হলে তো আপনার বউদির সঙ্গে একবার দেখা করতেই হয়।"

আমি বললাম, "অবশ্যই। আজ সন্ধের পর তোমরা সবাই মিলে আমাদের বাড়িতে চলে এসো। আমার মা খুব চমৎকার মাছের পুডিং বানাতে পারেন। ইন ফ্যাক্ট, তোমাদের নেমন্তন্ন করার জন্যই আমি আজ এসেছি।"

ঝরনা বলল, "আপনি আমার কথা জানতেন না। তাতেও কিছু আসে-যায় না। সরিৎদা সময় করতে পারলে আমি ওর সঙ্গে যেতে রাজি আছি।"

(বাড়িতে কাউকে নেমন্তন্ন করার এক্তিয়ার আমার নেই। কারণ, আমি টাকাপয়সা দিতে পারি না। টাকা যার, সব অধিকার তার। আর সন্ধে তো হয়েই এল, এর পর যদি সরিৎ সপরিবার আমাদের বাড়িতে আসে, তা হলে ওদের কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করবে কে? এটা সত্যিই আমার অন্যায় আবদার। তবু, কথাটা হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল যে! দেখা যাক!)

আমি বললাম, "বাঃ, এই স্পিরিটটা আমার খুব ভাল লাগল। আচ্ছা, আর একটি প্রশ্ন, তুমি কি, বাই এনি চান্স, অরিজিৎ দত্তগুপ্ত নামে কারওকে চেনো?"

প্রথমা বললাম, "অরিজিৎ দত্তগুপ্ত? হ্যাঁ চিনব না কেন? অনেকদিন। বাচ্চা বয়সে উনি বেশ কিছুদিন আমার প্রাইভেট টিউটর ছিলেন।"

আমি বললাম, "এখনও দেখা হয় মাঝে-মাঝে?"

প্রথমা ভুরু তুলে বলল, "হ্যাঁ হয় মাঝে-মাঝে। এই তো কয়েকদিন আগেই দেখা হল।"

আমি বললাম, "তারপর তোমরা বুঝি কোনও চায়ের দোকানে গিয়ে বসো?"

প্রথমা বলল, "হ্যাঁ, মানে আমি মাঝে-মাঝে আলিপুরের একটা ট্রেনিং সেন্টারে যাই, সেই সেন্টারের একেবারে পাশেই রয়েছে একটা চায়ের দোকান। অনেক সময়ই চেনাশুনো কারওকে দেখলে ওই দোকানটায় গিয়ে বসি। আপনি হঠাৎ আমাকে এই সব প্রশ্ন করছেন কেন? আমাকে জেরা করছেন? না, সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। নাকি আজকাল আপনি গোয়েন্দা, মানে ডিটেকটিভগিরি করতে শুরু করেছেন?"

আমি খুব দুর্বল গলায় বললাম, "এটা সেরকমই মনে হচ্ছে ঠিকই। তবে তোমাকে একটা কথা এখনই বলে নিই। তোমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়, এমন কিছুই আমি করব না। এটা একেবারে সত্যি। তোমাকে আমি আর একটা মাত্র প্রশ্ন করতে চাই। সেটা অবশ্য খুবই ব্যক্তিগত, তুমি ইচ্ছে করলে উত্তর না-ও দিতে পার। প্লিজ, আমার উপর রাগ কোরো না। তোমার কি ঐ অরিজিতের সঙ্গে প্রেমের ব্যাপার স্যাপার কিছু আছে? প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে ছাত্রীর প্রেম?"

প্রথমা বলল, "পাগল নাকি? উনি যখন আমায় পড়াতেন, তখন আমার বয়স আট-ন' বছর। ওঁর ব্যবহার এত ভাল ছিল, তাই প্রথম থেকেই ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করতাম। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, এখনও আমার মনে ওঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধা-শ্রদ্ধা ভাব আছে। তাঁকে সব সময় শ্রদ্ধা করতে হয়, তাঁর সঙ্গে কি প্রেম করা যায়? আমি বিয়ে করতে চাই একটা দুষ্টু-দুষ্টু লোককে, যার সঙ্গে আমার মাঝে-মাঝে খুব ঝগড়া হবে, তখন আমিও কাঁদব, সেও কাঁদবে, তাতেই প্রেম বেশি জমে। অনেকটা আপনার মতো একজন। কী নীললোহিতবাবু, হবে নাকি?"

আমি বললাম, "আমার যে বিয়ে করার এলেম নেই, তা জেনেই কোনও -কোনও মেয়ে আমার সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি করে। যদি হঠাৎ একদিন রাজি হয়ে যাই!"

প্রথমা মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে হাসতে লাগল।

আমার বুক থেকে যেন একটা পাষাণ ভার নেমে গেল। এই প্রথমার সঙ্গে আমার বউদির চেহারার বেশ মিল আছে। চুকলি কাটার দল এক চায়ের দোকানে এই প্রথমাকে দেখেই আমার বউদি ভেবে ভুল করেছে। আর প্রথমাও তার এক কালের গৃহশিক্ষকের সঙ্গে প্রেম করতে চায় না, ঝরনাদিরও আশঙ্কার কোনও কারণ নেই।

প্রথমাকে আর-একটি প্রশ্ন করার দরকার ছিল, কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না, বেজে উঠল দরজায় টুং টাং। প্রথমা দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

আমার বন্ধু সরিতের প্রবেশ। দু' হাতে দুটো বড়-বড় চটের থলে। আমাকে দেখেই সে কিছুটা বিস্মিত হয়ে বলল, "কী রে নিলু, তুই হঠাৎ এ পাড়ায়? আমার শ্যালিকার সঙ্গে প্রেম করছিলি বুঝি?"

তারপর প্রথমার দিকে তাকিয়ে বলল, "শোনো হে শ্যালিকা, যত ইচ্ছে প্রেম করতে পার, নিলু কিন্তু বড্ড টাকা ধার করে। যদি

AMARBOI.COM

কোনও রেস্টুরেন্টে তোমাকে নিয়ে যেতে চায়, দেন ডোন্ট গো। ও তোমার ব্যাগ থেকেই টাকা বার করে দিয়ে বিল মেটাবে।"

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই সে আবার বলল, "এ কী, তোমরা আমার বন্ধুকে এন্টারটেন করোনি? বাড়িতে তো সবই আছে, হুইস্কি, ব্র্যান্ডি, রাম, আমি এক ডজন বিয়ারও এনেছি। যাক গে, দাও দাও, দুটো গেলাস দাও, আর এক বোতল ঠান্ডা জল..."

প্রথমা বলল, "এ কী বাইরে এসেই, হাত-পা না ধুয়ে আগেই ওই সব শুরু করবেন? যান, বাথরুমে যান, ঘাড়ে জল দিয়ে আসুন— আজ একটু পরেই তো বেরোতে হবে। নীললোহিতের বাড়িতে আমাদের সবার নেমন্তন্ন!"

সরিত বেশ খানিকটা অবাক হয়ে বলল, "নিলুদের বাড়িতে নেমন্তন্ন? জানি না তো। কী রে, নিলু তুই আগে খবর দিয়েছিলি?"

আমি বললাম, "বাঃ, চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আসলে আমার মা তো তোর স্ত্রীকে দেখেননি। তাই দেখতে চেয়েছে।"

সরিৎ বলল, "সরি রে নিলু। আজ আমাদের পক্ষে যাওয়া অসম্ভব। আজই আমাদের ডিসি ডিভি-র বাড়িতে যেতেই হবে, বিরাট পার্টি, শুরুই হবে রাত ন'টায়, সেকানে না গেলে...

এর পরেও সরিতকে পীড়াপীড়ি করাটা বড্ড বেশি ভন্ডামি হয়ে যাবে। মনে-মনে সেই ডিসি ডিভিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, "তা হলে তো আর কথাই নেই, ডিসি ডিভি'র বাড়ি না গেলে তা হলে পরে একদিন..."

সরিৎ বললো, "দ্যাট্স রাইট, আর একদিন আমার বউ কোথায়, তার সঙ্গে তোর দেখা হয়নি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা হয়েছে, প্রথম এসেই..."

সে প্রথমাকে জিজ্ঞেস করল, "এখন সে কোথায়? বাথরুমে ঢুকেছে নাকি?"

প্রথমা বলল, "না। দিদি সেলাই করছে। ওর একটা ব্লাউজ ফেঁসে গেছে।"

এবার সরিৎ গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, "ছেঁড়া ব্লাউজ সেলাই করছে? পৃথিবীতে কোনও পুলিশ অফিসারের বউ কক্ষনো ছেঁড়া জামা সেলাই করে পরে না। সেটা সঙ্গে-সঙ্গে ফেলে দিয়ে তারা নতুন একটা রাস্তায় যে-কোনও লোককে জিজ্ঞেস করো, সবাই এই কথাই বলবে। বলবে, এটা বানানো, ফোটোগ্রাফির কারসাজি! যাক গে যাক, প্রথমা তুমি ওকে বলো, এক্ষুনি তিনটে নতুন ব্লাউজ কিনে আনতে। হ্যাঁ তার আগে দুটো গ্লাস দিয়ে যাও।"

আমি বললাম, "একটা গেলাস হলেই চলবে। আমার জন্য দরকার নেই।"

সরিৎ বলল, "তোর দরকার নেই। কেন, সূর্য ডুবে গেছে?"

আমি বললাম, "আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি (পুরোপুরি ছাড়িনি)। এই তো চা খেলাম।

সরিৎ বলল, "ছেড়ে দিয়েছিস? কেন রে?"

আমি বললাম, "আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, যতদিন না আমি নিজে কিছু রোজগার করছি, ততদিন আর আমি বন্ধুদের পয়সায় ওসব খাব না।" (এটা বলার সময় কোনও মহাপুরুষের আদর্শ বাণীর মতো আমার গলাটা বেশ ভাবগম্ভীর হয়ে গেল।)

সরিৎ বলল, "তা হলে আজ আমার এখানে খেলে তোর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে না। কারণ, কোনও বোতলই আমার নিজের পয়সায় কেনা নয়। অনেকে আমাকে ভেট দেয়। ঘুষ আর ভেটের মধ্যে তফাত আছে, তাই না?"

আমি বললাম, "তা থাকতে পারে। আমি টাকা রোজগার শুরু করলেই প্রথমে তোর মতো আরও অনেক বন্ধুকে ডেকে একটা বিরাট পার্টি দেব। আমি তো অনেকের কাছেই ঋণী, সেসব শোধ দেওয়ার পর সরিৎ হা-হা করে হেসে উঠল।"

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে সে বলল, "এ কথা সবাই জানে, তুই সারা জীবনেও তেমন কিছু টাকা রোজগার করতে পারবি না, বন্ধুদের ঋণ শোধ করাও তোর পক্ষে সম্ভব নয়। গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়, এই থিয়োরি নিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিবি।"

সরিতের স্বভাবই এই, সে নিজে অনর্গল কথা বলে যায়, অন্যদের কথা শুনতেই চায় না।

হুইস্কির গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে সে আবার বলল, "কীরকম কাকতালীয় ব্যাপার দ্যাখ, আমি আজ সকাল থেকে তোর কথা ভাবছি, একবার টেলিফোনও করেছিলাম, নাই তখন এনগেজড ছিল, তারপর এত সব... আর তুই নিজে থেকেই আমাদের বাড়ি চলে এলি। আমি ইনফ্যাক্ট কাল গভীর রাত্তিরে..."

কথা থামিয়ে সে প্রথমার দিকে তাকিয়ে বলল, "ওগো দেবী, তুমি একটি বার ভিতরে যাবে? আমার বন্ধুর সঙ্গে দু'-একটা প্রাইভেট কথা আছে।"

প্রথমা উঠে যাওয়ার পর সরিৎ আবার বলল, "তোকে মাঝরাত্তিরেই ফোন করতে চেয়েছিলাম, একটা বিশেষ কারণে তখন মনে পড়ল, ফোনটা তো থাকে তোর দাদা-বউদির ঘরে।"

আমি বললাম, "সেই বিশেষ কারণটা কী রে?"

সরিৎ বলল, "তোদের পাড়ায় কাল গভীর রাত্তিরে একটা রেপ হয়। একটু বাদেই পুলিশ সেখানে পৌঁছে যায়। ততক্ষণে কালপ্রিটরা মোট তিনজন, চম্পট দিয়েছে। পুলিশ রিপোর্ট পেয়েছে, সেই তিনজনের মধ্যে তুই একজন সাসপেক্ট! তোকে কাল রাত্তিরেই অ্যারেস্ট করতে চেয়েছিল—"

আমি বললাম, "রেপ... সাসপেক্ট আমি?"

AMARBOI.COM

সরিৎ বলল, "যারা তদন্ত করছে, তাদের একজন জানে, তুই আমার এক বিশেষ ফ্রেন্ড, সে-ই আমায় খবরটা দিয়ে ফোন করল, শুনে তো আমি খুবই শক্‌ড। তারপর মনে হল, তোর মতো আমার একজন প্রিয় বন্ধু যদি হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় একটা রেপ করেই থাকে, তা বলে কি আমি তার পাশে দাঁড়াব না?

এবার আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। চোখ গরম করে বললাম, "তোকে একটা থাপ্পড় মারব ইডিয়েট। তুই ধরে নিলি, আমি সত্যিই কারওকে রেপ করতে পারি? তুই চিনিস না আমাকে? এরকম বন্ধু থাকলে আর শত্রুর দরকার কী? আমি চলি। আর কোনওদিন....

আমি সদর্পে উঠে দাঁড়ালাম।

সরিৎ হাসতে-হাসতে আমার একটা হাত টেনে ধরে বলল, "দাঁড়া, দাঁড়া, শোন। তুই যে এতটা রেগে উঠলি তাতেই প্রমাণ হয়, তুই এ ব্যাপারে কিছুই জানিস না। কিন্তু জানিস তো ভাই, সবাই বলে, পুলিশ যাকে একবার ছোঁয়, তার লেগে থাকে আঠারো ঘা। আমি নিজে পুলিশ হয়েও এটা মানি। একবার যখন তোর নাম উঠেছে, পুলিশ তোর পিছনে লেগে থাকবে। আমাদের বাড়ির সামনে একটা পিনক্লোদস পুলিশকে ঘোরাঘুরি করছে দেখলাম, নিশ্চয়ই তোকে ফলো করছে। এ ক্ষেত্রে আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে, তুই কিছুদিন কলকাতার বাইরে কোথাও গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাক। বিহারে আমায় একজন আত্মীয়ের একটা চমৎকার বাংলোবাড়ি আছে, একেবারে নদীর ধারে। তুই যদি চাস, তা হলে আমি সেখানে তোর জন্য ব্যবস্থা করে দিতে পারি। সেখানে পাবি সব কিছু।"

আমি বললাম, "পুলিশ আমার নামে একটা ফলস কেস দেবে,

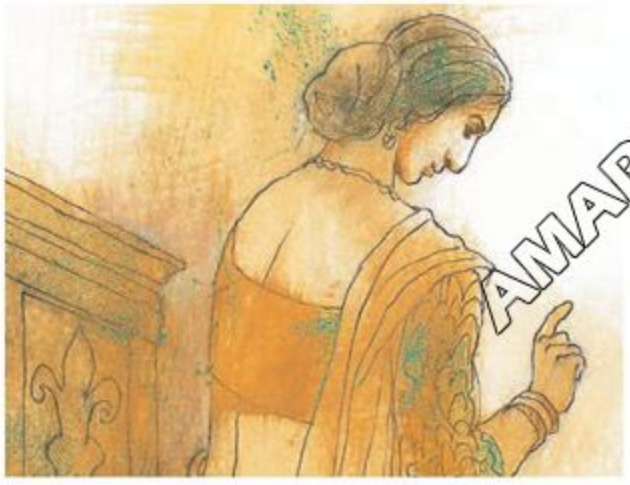

আর সেই ভয়ে আমি কলকাতা ছেড়ে পালাব? নেভার।"

জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে আমি চলে গেলাম দরকার দিকে। সেই সময়ই বেজে উঠল সরিতের মোবাইল ফোন। সে কথা বলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আমি দরজা খুলে বেরিয়ে গেলাম বাইরে। একটু-একটু বৃষ্টি পড়ছে, তাতে কিছু আসে যায় না।

উপরের বারান্দা থেকে সরিৎ চেঁচিয়ে বলল, "এই নিলু, নিলু, দাঁড়া, প্লিজ। আমি এক্ষুনি আসছি, একটা সাঙ্ঘাতিক কথা আছে। প্লিজ, যাসনি।"

সরিৎ দৌড়ে চলে এল নীচে।

আমি ওর কোনও কথা শুনতে চাই না ভেবে চলে যেতে চাইলেও পা বাড়াতে পারলাম না। ঠিক এই সময় সামনে এসে পড়ল একটা বিড়াল। সে সামনে গিয়ে ট্যারা চোখে তাকাল আমার দিকে।

আমি বিড়ালের সংস্পর্শ সচরাচর এড়িয়ে চলি। বিড়ালের তুলনায় বাঘ আমার বেশি পছন্দের।

বেড়ালটা দু'বার ম্যাও ডেকে লাফিয়ে চলে গেল ডান দিকে। ততক্ষণে সরিৎ পৌঁছে গেছে আমার পিছনে। ঘাড়ে একটা চাপড় মেরে সে বলল, "এইমাত্র একজন আমায় কী খবর দিল বল তো?"

আমি ঝাঁঝাল গলায় বললাম, "তা আমি কী করে জানব?"

সরিৎ বলল, "আন্দাজ কর। তিনটে চান্স।"

আমি বললাম, "ধ্যাৎ, ওসব ন্যাকামি করার সময় নেই আমার।"

সরিৎ বলল, "এটা এক নম্বর চান্স গেল। তারপর, নেক্সট, নাম্বার টু?"

আমি বললাম, "দ্যাখ সরিৎ, আমার সত্যিই একটা জরুরি কাজ আছে, এক্ষুনি যেতে হবে। তোর যদি জরুরি কিছু বলার থাকে, চটপট বলে ফ্যাল।"

সরিৎ বলল, "প্রথম খবর হচ্ছে, তোদের পাড়ায় কাল রাত্রে কোনও রেপ কেস হয়নি। হয়েছে পাশের রাস্তা মধু হালদার স্ট্রিটে। এটা একটা ভাল খবর নয়।

আমি বললাম, "এটাই সত্যি কথা। আমি তো জানিই।"

সরিৎ বলল, "পুলিশ খুব তাড়াতাড়ি কাজ করেছে। ওই রেপ কেসের তিনজন আসামিই ধরা পড়েছে। ওদের একজনের নাম নীলকণ্ঠ, সেই নামের সঙ্গে তোর নাম গুলিয়ে ফেলেছিল পুলিশের এক শ্রীমান। তার মানে, তুই এখন স্কট ফ্রি।"

বিড়ালটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়ে আমাদের দেখছে, মাঝে-মাঝে ম্যাও-ম্যাও করছে। যেন ও শুনতে পাচ্ছে সব কথা, বুঝতেও পারছে।

তক্ষুনি আমি বুঝতে পারলাম, কাল রাত্তিরের বিদঘুটে স্বপ্নটার আসল মানে বিদঘুটে বলেই মনে আছে। ওখানে একটাই জরুরি শব্দ, পুলিশ। অর্থাৎ আমাকে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আর পুলিশ বলতে তো আমি একমাত্র সরিৎকেই চিনি। সেই জন্যই আজ সকালে সরিতের বাড়িতে আসার ইচ্ছে হল। ভাগ্যিস এসেছি।

স্বপ্ন কে বানায়? বাইরের কোনও ---কোম্পানি। যে-কোনও দৃশ্যের জন্যই তো একটা চিত্রনাট্য দরকার। আমি তো তা বানাতে পারি না, কোথায় তৈরি হয়, তাও জানি না। তবে কি এটাও অবচেতনার কারবার। থ্যাঙ্ক ইউ অবচেতন, তুমি এবারে সত্যিই অনেক উপকার করলে! আরও অনেকে, এমনকী ওই বিড়ালটি পর্যন্ত। ঠিক সময়ে সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। থ্যাঙ্ক ইউ, অল অফ ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার হুলো।

আমি কেন ইংরিজি বলছি? নিশ্চয়ই আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম, ভয় পেলেই বাঙালির মুখ দিয়ে ইংরিজি বেরোয়। প্রথমার সঙ্গে আর দেখা হল না।

॥ ৪ ॥

বৃষ্টি এখন আর টিপিটিপি নয়, ঝমাঝমও নয়, বলা যায় তার মাঝামাঝি। আকাশের অবস্থা দেখে মনে হয়, এরকমই টানা অনেকক্ষণ চলবে।

আমার বৃষ্টি ভিজতে ভাল লাগে। এতদিন যা গরম চলছিল, উফ!

পিনাকেশদার বাড়ির রাস্তাটা এমনিতেই কাদা-কাদা, তার উপর আবার খোয়া-খোয়া ইট মাথা তুলে আছে। সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। একটু অন্যমনস্ক হলেই পা পিছলে আলুর দম।

বৃষ্টির সময় সব রাস্তার চেহারাই কেমন যেন বদলে যায়। দু'পাশের সব বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ। সেই জন্যই বাড়িগুলোর আসল চেহারা আর বোঝা যায় না। রাস্তায় মানুষজন নেই, দোকান-টোকান খোলা না বন্ধ বোঝার উপায় নেই তাও।

পিনাকেশদার বাড়িতে আমি অন্তত দু'বার এসেছি, কিন্তু এখন

AMARBOI.COM

যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। রাস্তাটা ধরেছি ঠিকই, কিন্তু বাড়ির নম্বর তো লিখে আনিনি। চেনা বাড়ির নম্বর কে আর মনে রাখে!

বেশ খানিকটা পরে একটা দোকান দেখতে পেলাম, সেটা খোলা তো বটেই, ভিতরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো। সম্ভবত হ্যাজাকবাতি। সেই দোকানের দিকে আমার পা দু'টো ঘুরিয়ে দিলাম। দোকানটির সামনে খানিকটা চালা মতন। বৃষ্টি লাগে না।

চা-বিস্কুট-লজেন্স আর ছোটখাটো জিনিসের মনোহারি দোকান। একজন প্রৌঢ় মানুষ খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু একটা বই পড়ছেন।

কাউকে কোনও বই পড়তে দেখলে প্রথমেই জানার কৌতূহল হয়, সেটা কী বই। আবার, একজন অচেনা লোক এসে প্রথমেই সেটা জানতে চাওয়াটা ঠিক ভদ্রতা সঙ্গত নয়।

লোকটির মনোযোগ ভঙ্গ না করে সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কয়েক সেকেন্ড পরেই তিনি মুখে তুলে আমার দিকে চাইলেন। তাঁর ঠোঁটে ফুটে উঠল একটু খুশির ভাব। তিনি বললেন, "ও, তুমি এসে গিয়েছ? বাঃ! ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছ না তো? আমি বলে দিচ্ছি, খুব সোজা।"

এবার আমার হকচকিয়ে যাওয়ার পালা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কী করে জানলেন যে আমি..."

তিনি বললেন, "বাঃ! পিনাকেশবাবু যে দু'বার এসে বলে গেলেন, তাঁর একজন অতিথি আসবে, সে চিনতে না-ও পারে, তা হলে তাকে... মানে আমি তো তোমার জন্যই দোকান খুলে বসে আছি।"

আমি বললাম, "থ্যাঙ্ক ইউ! কিন্তু আমাকে দেখে আপনি কী করে বুঝলেন যে আমিই সেই লোক? রাস্তা দিয়ে যে-যাবে, তাকেই আপনি ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করছেন?"

তিনি বললেন, "না, না, ডেকে জিজ্ঞেস করতে হবে কেন? তোমাকে কি আমি ডেকেছি? তুমি তো নিজের থেকেই এখানে এসেছ! তাই না?"

এটাও আমার তেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে হল না। খটকা রয়েই গেল।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন দোকানের পিছন দিকে। হাতের বইটা সামনে উলটে রেখে আমি উঁকি মেরে গলা বাড়িয়ে বইটার মলাটের নাম পড়ার চেষ্টা করলাম। রবীন্দ্রনাথের বহু ভক্তই তাঁর এই বইটা পড়েনি। আমি জানি। তার প্রমাণ তো আমিই। আমিও খুব রবীন্দ্রনাথের ভক্ত, কিন্তু আমিও তো তাঁর এই বইটি কখনও উলটেও দেখিনি। আর এই দোকানদার... মাইকেল মধুসূদন একবার এক মুদিখানায়...

দোকানদার বাবুটি ফিরে এসে বললেন, "এই নাও, এটা তোমার জন্য রাখা আছে।"

তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন একটা চৌকো রঙিন প্যাকেট। নীল চকচকে কাগজ দিয়ে মোড়া, সাদা সুতোয় বাঁধা। সাইজ, একটা জুতোর বাক্সের মতন।

আমি সেটা হাতে নেওয়ার পরই তিনি বললেন, "না, না, তোমার ডিউটি এখনও শেষ হয়নি, তোমাকে একবার পিনাকেশদার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। খুব জরুরি।"

অনেক মানুষ মনে-মনেও কাঁধ ঝাঁকায়, যখন সে ভাবে ঠিক আছে, দেখাই যাক না।

দোকানদারটি বাইরে এসে আমায় বললেন, "ওই যে একটা আমগাছ দেখা যাচ্ছে, ঠিক তার পিছনের বাড়িটা।"

আমি বললাম, "আমগাছ কোথায়, ওটা তো একটা তেঁতুলগাছ। আর তো কোনও গাছ নেই।"

লোকটি কিছুটা বিব্রত ভাবে বললেন, "তাই নাকি? তেঁতুলগাছ! আমি ভাল গাছ চিনি না।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনিই কি এই দোকানটার মালিক! কত দিন এই দোকানটা..."

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমিই মালিক, মামলায় জিতেছি। দোকানটা চলছে পাঁচ বছর তিন মাস সতেরো দিন।"

অনেক মানুষই অনেক গাছ চেনে না। তা বলে, পাঁচ বছর দোকান চালাচ্ছে এমন মানুষ আমগাছ আর তেঁতুলগাছের তফাত জানবে না? অবিশ্বাস্য মনে হয়।

আমি বললাম, "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার নামটা জানা হল না।"

তিনি বললেন, "মহেশ্বর দাস শর্মা।"

মহেশ্বর মানে শিবের এক নাম। তারপর পিনাকেশ, নীলকণ্ঠ, আজ সারা দিন শিবদের পালাই চলছে। আরে, আমার নিজের নামেরই একটা মানে মহাদেব।

বৃষ্টি অনেকটা কমেছে, এর মধ্যেই শাঁ শাঁ করে উঠল ঝড়। সারা আকাশ আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে চমকাল বিদ্যুৎ, তারপরই কানে তালা লাগাবার মতন বিকট, ভয়ঙ্কর বজ্রপাত।

আমি বলে উঠলাম, "ওরে বাবা। এত কাছ থেকে ওই আওয়াজ শুনলে সত্যিই একবার ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে। এ বছর অনেক মানুষ বজ্রাঘাতে মরেছে, একসঙ্গে সাতজন-আটজন। এই সময় কোনও গাছের নীচে দাঁড়ালে নির্ঘাত মৃত্যুর সম্ভাবনা। খোলা আকাশের তলায় থাকাও সেফ না।

আমি দোকানদার মহেশ্বরকে বললাম, "চলুন, চলুন, ভিতরে গিয়ে বসা যাক একটুক্ষণ।"

তিনি তাঁর মুখের হাসিটি মুছে ফেলে খানিকটা কঠোর স্বরে বললেন, "আমি তো আর আমার দোকান খোলা রাখতে পারব না।

AMARBOI.COM

কামাক্ষ্যা তন্ত্রের দ্বারা
নিশ্চিত বশীকরণে সাফল্য

ব্যর্থ প্রেম, দাম্পত্য কলহ, শত্রু দমন, বিদ্যা সহ যেকোন সমস্যায়
তান্ত্রিক জ্যোতিষ
রাজশ্রী শাস্ত্রী
★ দক্ষিণা 101 টাকা ★
9874653784
9874653845
শিয়ালদা (প্রতি সোমবার), বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, বনগাঁ, বর্ধমান, মেদিনীপুর, কাঁথি, মেচেদা, করিমপুর, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, মালদা

কামাক্ষ্যাতন্ত্রে দ্রুত বশীকরণ
শুধুমাত্র দক্ষিণা, প্রতিকারের পরে মূল্য

দাম্পত্য কলহ, শত্রু দমন ও বিদ্যা সহ যে কোন সমস্যায়
তান্ত্রিক জ্যোতিষ
শ্রী কাশীনাথ শাস্ত্রী
★ দক্ষিণা 351 টাকা ★
9830296650
9163145932
* ডাকযোগেও প্রতিকার করা হয় *
শিয়ালদা (প্রতি বৃহস্পতিবার), বালুরঘাট, মালদা, বহরমপুর, তারাপীঠ, বর্ধমান, চুঁচুড়া, মেদিনীপুর, মেচেদা, ব্যারাকপুর, দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, শিলিগুড়ি, আসানসোল

৫ মিনিটে বশীকরণ

ব্যর্থ প্রেম, দাম্পত্য কলহ, শত্রু দমন, বিদ্যা সহ যেকোন সমস্যায়
তান্ত্রিক জ্যোতিষ
শ্রী নিত্যানন্দ শাস্ত্রী
★ দক্ষিণা 101 টাকা ★
M: 7602997728
শিয়ালদা (প্রতি শুক্রবার), মেদিনীপুর, হলদিয়া তারাপীঠ, বনগাঁ, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, মালদা রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি, বর্ধমান

বাড়ি ফিরতে হবে, থাকি অনেক দূরে, সেই বাগবাজারে।"

আমি বললাম, "এই ওয়েদারের মধ্যে আপনি ফিরবেন কী করে? এই অবস্থাটা সত্যিই বেশ পিপজ্জনক।"

তিনি বললেন, "তুমি একটা কাজ করো না ভাই! এক দৌড়ে, ওই গাছটার কাছে চলে যাও। তারপর আমার ব্যবস্থা আমি বুঝব।"

যেসব মানুষ একটু পরে-পরেই মত বদলায়, তাদের ট্যাকল করা মুশকিলের ব্যাপার। একটু আগে তিনি মধুমাখা গলায় কী ভাল ব্যবহারই না করছিলেন। এখন তিনি আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে পাঠাতে চাইছেন। বাড়ি ফেরার জন্য আর দশ-পনেরো মিনিট দেরি হলে কী এমন ক্ষতি হয়?

শুরু করলাম দৌড়।

এই বাজ পড়ার ব্যাপারটা আমি এখনও ঠিক বুঝি না। মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি লাগলে তৈরি হয় প্রচণ্ড ইলেকট্রিকের শক্তি, কিন্তু মেঘ কি কঠিন জিনিস যে ঠোকাঠুকি লাগবে? ছেলেবেলায় অনেক রূপকথার গল্পে বাজপাখির কথা পড়েছি। সেই পাখিই নাকি মানুষের মৃত্যু নিয়ে আসে আকাশ থেকে।

তেঁতুলগাছটার পিছন দিকে বাড়িটা চেনা লাগল। হ্যাঁ, এই বাড়িতেই এসেছি আগে দু'বার। ঢোকার দরজাটা পিছন দিকে।

সেই দরজার কাছে গিয়ে ধাক্কা দেওয়ার জন্য হাত তুলেছি, তার আগেই খুলে গেল দরজাটা।

এক-এক সময় খুব তুচ্ছ ব্যাপারকেও অলৌকিক মনে হয়। আমি এসে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই খুলে গেল দরজাটা? এয়ারপোর্ট কিংবা বড়-বড় শপিং মলে এই ম্যাজিক ডোর চালু হয়ে গিয়েছে,

তা বলে একটা ছোট প্রাইভেট বাড়িতে?

দরজাটা খুলে যাওয়ার পর দেখা গেল, একটু দূরে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে পিনাকেশদা। খাকি প্যান্ট আর একটা সবুজ গেঞ্জি পরা। পিনাকেশদা দরজা খোলেননি, এর মধ্যে অতটা পিছিয়ে যাবেন কী করে? যাক গে।

পিনাকেশদা উৎফুল্লভাবে বললেন, "নিলু, এসেছিস? জাস্ট ইন টাইম। ভিজেছিস তো খুব দেখছি। তুই এখানে এসে দাঁড়া, আমি একটা তোয়ালে আনছি, মাথাটা ভাল করে মুছে নে।"

সিঁড়ির তলায় অন্ধকার জায়গাটায় খাঁচার মধ্যে কিছু একটা জন্তু রাখা রয়েছে, তার নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।

মাথাটাথা মোছার পর পিনাকেশদা আমাকে বসবার ঘরে নিয়ে এলেন। এক দেওয়ালে একটা হরিণের শিং-সুদ্ধ মাথা। আরও এক দেওয়ালে একটা বাচ্চা কুমির। একটা বড় মাকড়সা। একঝাঁক পাখি এমনই জীবন্ত যে, মনে হয় এক্ষুনি উড়ে চলে যাবে।

পিনাকেশদা বললেন, "কী খাবি বল। সে জন্য পনেরো মিনিট সময় ধরা আছে। তারপর আসল কাজ।"

আমি বললাম, "পিনাকেশদা, আমি এখন কিছুই খাব না। একটু আগেই খেয়েছি, পেট ভর্তি।"

পিনাকেশ বলল, "কী খেয়েছিস?"

আমি বললাম, "ইয়ে, কচুরি আর আলুর দম। আর জিলিপি।"

পিনাকেশ বলল, "কোন দোকানের? বাঞ্ছারাম না গাঙ্গুরাম না পুঁটিরাম? ওরিজিনাল দোকান, না ফ্র্যানচাইজি?"

আমি বললাম, "আমাদের পাড়ায় নতুন একটা দোকান খুলেছে, ট্রাম লাইনের ধারে। ওরা যা দুর্দান্ত আলুর দম বানায়, একেবারে দশে দশ।"

পিনাকেশ বলল, "তোর জন্য ফুচকা আর দই বড়া আনিয়ে রাখা হয়েছে। তা খাবি না?"

আমি বললাম, "মানে, ইয়ে, কেউ ফুচকা খাওয়ার প্রস্তাব দিলে তখন আর তা রিফিউজ করার মতন মনের জোর পাই না। আচ্ছা খাব গোটা দুয়েক।"

পিনাকেশ বলল, "দুর বোকা। দু'টো ফুচকা কেউ খায়? অন্তত দশটা না খেলে ফুচকার আসল স্বাদই পাওয়া যায় না। এই তো আমি গত শনিবার মোট একুশটা খেয়েছি।"

এই সব কথার মাঝখানেই একজন বুড়ো মতন কাজের লোক এক গামলা ভর্তি ফুচকার তৃপ আর তেঁতুলের জলটল সব নিয়ে এ ঘরে চলে এল। এটাও যেন ম্যাজিকের মতন।

পিনাকেশদা বললেন, "আমার হঠাৎ খুব পায়ে ব্যথা হয়েছে, সিঁড়ি ভাঙতে খুব কষ্ট হয়। তবু তো তিনতলায় উঠতেই হবে একবার। আমি এখন ফুচকা খাব না। তুই খা। নিজেরটা বানিয়ে নিতে পারবি তো?"

পায়ের ব্যথার সঙ্গে ফুচকা খাওয়ার কী সম্পর্ক, তা আমার বোধগম্য হল না।

বাড়িতে বানানো ফুচকা যতই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোক, তার থেকে রাস্তায় দাঁড়ানো ফুচকাওয়ালাদের তৈরি ফুচকার স্বাদ অনেক ভাল। ওদের হাতে হাজা, সেই হাত বার-বার ডুবিয়ে দেয় তেঁতুলের জলে, আলু-ছোলা মাখার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় দু'-একটা পচা আলু। সেই জন্যই স্বাদ এত ভাল হয়ে যায়।

ফুচকা নামটা এখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে গিয়েছে, সেটা বাংলা না হিন্দি শব্দ তাও জানি না। বাবার কাছে শুনেছি, তাঁরও বাবার আমলে একে বলা হতো জল কচুরি। সেই নামটাই সুন্দর ছিল।

আমি সবেমাত্র ছ'টা শেষ করেছি। পিনাকেশদা বলল, "টাইম ইজ আপ, নাউ, চল তিনতলায়।"

আমি বললাম, "তোমার পায়ে ব্যথা, তাতে তিনতলায় উঠতে হবে কেন? দাদার জন্য একটা প্যাকেট নিয়ে যাওয়ার কথা, কাউকে বলে সেটা আনিয়ে নিলেই তো হয়। কিংবা আমিই সেটা নিয়ে আসতে পারি, যদি কোথায় আছে বলে দাও।"

পিনাকেশদা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, "না, না, আমি তোকে একটা দামি প্যাকেট সাবধানে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিচ্ছি, তার মধ্যে সাপ-ব্যাঙ কী আছে তা তুই একটুও জানবি না তা কখনও হয়?"

আমি বললাম, "দাদা আমাকে স্পেসিফিকেলি বলে দিয়েছে, এর ভিতরে কী আছে, তা কারউকে জানতে দেওয়া হবে না। এমনকী আমারও খুলে দেখার অধিকার নেই।"

পিনাকেশদা বলল, "ননসেন্স! ব্যাপারটা এখন আমি সিক্রেট রাখতে চাই, তা বলে আমাদের ফ্যামিলির লোকেরা কিছু জানবে না? এসব কাজে ফ্যামিলির সাপোর্ট না পেলে বেশি দূর এগনোও যায় না। চল, ছাদে চল।"

পিনাকেশদা এক পা এক পা করে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল, বেশ ব্যথা পাচ্ছেন বোঝাই যায়। আমি ওর পিছনে-পিছনে।

AMARBOI.COM

দোতলায় এসে খুব হাঁপাতে লাগল। আমি বললাম, "এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও।"

পিনাকেশদা বাণী দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "কালই আমার বিশ্রাম। বৃষ্টি হচ্ছে, মানুষের প্রতি প্রকৃতি দেবীর এক অতি সুন্দর উপহার। জল ছাড়া মানুষ বাঁচে না। মঙ্গল-বুধ-বেস্পতি-শুক্র-শনি এই সব গ্রহে বৃষ্টিও পড়ে না, তাই মানুষ-টানুষ কিংবা কোনওরকম প্রাণের চিহ্নই নেই। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবী ও মানুষ প্রকৃতি দেবীর বিশেষ ফেভারিট।"

আমার ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। আর কোনও গ্রহে জল নেই? কিছু কিছু বিজ্ঞানী যে বলছিল, কোনও গ্রহের মাটির তলায় জমে আছে অনেক বরফ। এ সবই আমার খবরের কাগজ পড়া জ্ঞান। এই অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী নিয়ে পিনাকেশদার কথার প্রতিবাদ করতে যাওয়াও ঠিক নয়।

সে আবার বলতে লাগল, "কেউ-কেউ প্রকৃতির বদলে এখানে ভগবানকে টেনে আনতে চায়।"

একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক মহিলা। ইনি পিনাকেশদার স্ত্রী শিবানী। আমাকে চিনতে পারেননি, গজগজ করে বলতে লাগলেন, "বৃষ্টি থেমেছে? কী জ্বালাতন! পড়ছে তো পড়ছেই, জামা-কাপড় শুকোতে দেওয়ারও উপায় নেই।"

পুলকেশদা আমার দিকে চোখ নাচিয়ে বলল, "এই ভদ্রমহিলাই দিন দশেক আগে বলেছিলেন, "উঃ কী গরম, কী গরম। ভগবান কি এ বছর আমাদের জন্য বৃষ্টি পাঠালেন না? চল, আমরা ওপরে যাই।"

তিনতলায় একটি মাত্র ঘর, তার পাশে খানিকটা ছাদ। সেই ছাদেরই খানিকটা অংশে টিনের চাল দিয়ে ঢাকা, সেখানে একটা টেবিল আর চেয়ারও রয়েছে। খুব সম্ভবত বৃষ্টির ছাঁট এ পর্যন্ত পৌঁছয় না।

আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে পিনাকেশদা চলে গেল ঘরের মধ্যে।

বৃষ্টি পড়ছে এখনও, তবে তেজ বেশি নয়। মাঝে-মাঝে বৃষ্টি আর বজ্রের কারবারও চলছে, আওয়াজটা সরে যাচ্ছে খানিকটা দূরে। আর সেদিকেই রয়েছে অনেক গাছপালা।

একটু পরেই পিনাকেশদা আমার প্যাকেটটার মতন হুবহু আর-একটা প্যাকেট আর কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে এল।

আমার হাতের প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে বলল, "শোন, এখান থেকে ফেরার পথে যদি কেউ তোকে চেপে ধরে, তা হলে একটা তর্কাতর্কি করে তুই ওটা দিয়ে দিবি। ওর মধ্যে সেরকম দামি কিছু নেই। সব ভুসিমাল। আমার হাতেরটাই আসল, এটা খুব সাবধানে নিয়ে যেতে হবে।"

একটু থেমে আবার সে বলল, "আমার হাতেরটার মধ্যে কী আছে জানিস কিংবা আন্দাজ করতে পারিস?"

আমি সঙ্গে-সঙ্গে দু'দিকের মাথা দুলিয়ে বললাম, "না।"

পিনাকেশ বলল, "এর মধ্যে রয়েছে কয়েকটা ফর্মুলা, আমার নিজের আবিষ্কার। এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি তিনবার, প্রত্যেকবারই সাকসেসফুল! এবার এটার কথা জানাজানি হলে সারা পৃথিবী জুড়ে হইহই পড়ে যাবে।"

আমি বললাম, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব? এটার সঙ্গে আমার দাদার কী সম্পর্ক? দাদা তো সায়েন্স-টায়েন্স কিছু বোঝে না।"

পিনাকেশ বলল, "আমি কলেজে পিওর সায়েন্স পড়েছি, তোর দাদা শিবু পড়েছে কমার্স। এখন আমি হয়েছি সায়েন্টিস্ট, তোর দাদা তো একটা কমার্শিয়াল ফার্মে বেশ বড় কাজ করে। বিজ্ঞানের সঙ্গে বাণিজ্যের খুব ভাল সম্পর্ক রাখতে হয়। বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন ব্যাপার আবিষ্কার করবে, আর তার বাস্তব রূপ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে ব্যবসায়ীরা। যেমন ধর, এই যে আলোর বাল্ব, এটা আবিষ্কার করেছেন আমেরিকান বিজ্ঞানী এডিসন। এখন যে পৃথিবীর সব দেশেই গ্রামে-গ্রামেও সেই বাল্ব কিনতে পাওয়া যায়, সেটা তো ব্যবসায়ীদের কৃতিত্বে। তুই কি জানিস, কেউ যখন কোনও যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করে, তখন সঙ্গে-সঙ্গেই সেটা পেটেন্ট করে নিতে হয়, যাতে অন্য কেউ ভাগ না বসায়। আমাদের জগদীশ বোস সেই কাজটি করেননি, তাই তাঁর নোবেল পুরস্কারটা ফসকে গেল। আমি তবা সেই ভুল আর করছি না। আটঘাট বেঁধে এগোচ্ছি। ৫ বছরের মধ্যে আমি নোবেল প্রাইজ পাবই পাব।"

আমি বললাম, "তা হলে তো আমাদের খুব গর্ব হবে।"

পিনাকেশ বলল, "তার জন্য খাটতে হবে। বিজ্ঞানের আর একটা শর্ত আছে। শুধু কোনও থিওয়োরি দিলেই হবে না। হাতে-কলমে তার ব্যবহারের প্রমাণ দিতে হবে। আমি যার জন্য রেডি, অবশ্য সেজন্যও তোর দাদার কোম্পানির মতো কোনও বড় কোম্পানির সাহায্য নিতে হবে। আমি কী আবিষ্কার করেছি, সে সম্পর্কে তোর কোনও ধারণা আছে?"

আমি বললাম, "আমি তো সায়েন্সের কিছু বুঝি না।"

পিনাকেশ ধমকের গর্জন করে বলল, "শিখতেই হবে, প্রত্যেককে সায়েন্স শিখতেই হবে। তুমি আর্টস, কমার্স, বায়োলজি এই সব কিছু পড়তে চাইলেই বেসিক সায়েন্স শিখতেই হবে। না হলে এ যুগের সঙ্গে পা মেলাতে পারবে না।"

পিনাকেশদা টেবিলের তলা থেকে বার করল একটা স্পিরিট ল্যাম্প আর একটা সসপ্যান। হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জলই ভরে নিল সসপ্যানে, তারপর তার মধ্যে ফেলল কিছু ঘাস-পাতা আর পাথর-টাথরের টুকরো। তারপর স্পিরিট ল্যাম্পে ফোটাতে লাগল

AMARBOI.COM

এশিয়া শ্রেষ্ঠ বিবাহ বন্ধনীর সার্ভিস মানেই
পাত্র পাত্রীর বিবাহ সুনিশ্চিত Since 1970
পাত্র পাত্রীর Status যাহাই হোক না কেন Divorce / Widow ও মাঙ্গলিক (India / NRI) সাত রকম পরিষেবায় কম খরচে Category Zed এ ₹ 3000 S.R. (Success or Refund) ₹5000 + ₹2000 = ₹7000 Service এ মাত্র ১ থেকে ৪ মাসের মধ্যে 100% যোগাযোগ নিশ্চিত করুন। বিবাহ স্থির হলে অবশ্যই সরকারী নিয়মানুযায়ী রেজিস্ট্রি করে নেবেন। 48A, মহাত্মা গান্ধী রোড (আমহার্স্ট স্ট্রীট জংশন) কলি - ৯।
2241-6404 / 6038, 9883106143
Home Service এর সুব্যবস্থা আছে।

সেগুলো।

আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কি জানিস, আকাশে অনেক মেঘ জমে থম মেরে আছে, অথচ বৃষ্টি হচ্ছে না। তখন মেঘ ফাটিয়ে বৃষ্টি নামাতে পারে কিছু-কিছু বিজ্ঞানী?"

আমি বললাম, "জানি, মানে কাগজে পড়েছি। কয়েক বছর এ নিয়ে খুব আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু সেটা খুব সাকসেসফুল হয়নি বোধ হয়। এখন তো আর সেসব বিষয়ে খবরের কাগজে কিছু লেখা দেখি না। মেঘ ফাটিয়ে বৃষ্টি নামাবার কথাও শোনা যায় না।"

পিনাকেশদা বলল, "এগজাক্টলি। ওদের থিয়োরি খুব দুর্বল ছিল। কোনও একটা থিয়োরি নিয়ে কাজ করতে গেলে, তার প্রস অ্যান্ড কন—এই দু'টো দিক নিয়ে ভাবতে হয়। আমার থিয়োরি অনেক সলিড। মানুষের কত উপকার হবে। আমি যে কেমিক্যালটা তৈরি করেছি, সেটা বৃষ্টি নামাবার জন্য নয়, বৃষ্টি থামানোর জন্য।"

আমি বললাম, "বৃষ্টি থামানোর জন্য?"

পিনাকেশ বলল, "হ্যাঁ। অতি বৃষ্টিতে কত দেশের কত ক্ষতি হয়। শুরু হয় বন্যা, তাতে হাজার-হাজার বাড়িঘর নষ্ট হয়, বহু লোকও মরে। সুন্দরবনের কথাই ভেবে দ্যাখ না। আমি চিরকালের জন্য পৃথিবী থেকে বন্যা মুছে দেব। যখন ইচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে বৃষ্টি পড়ুক, কতটা পড়েছে তার হিসেব রাখতে হবে। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই স্টপ। আমি যে কেমিক্যাল বানিয়েছি সেটা কোনও মেঘের গায়ে একটু ছোঁয়াতে পারলেই সব মেঘ পোঁ পোঁ করে পালাবে সমুদ্রের দিকে।"

আমি বললাম, "মেঘের গায়ে কেমিক্যাল ঢালবে কী করে?"

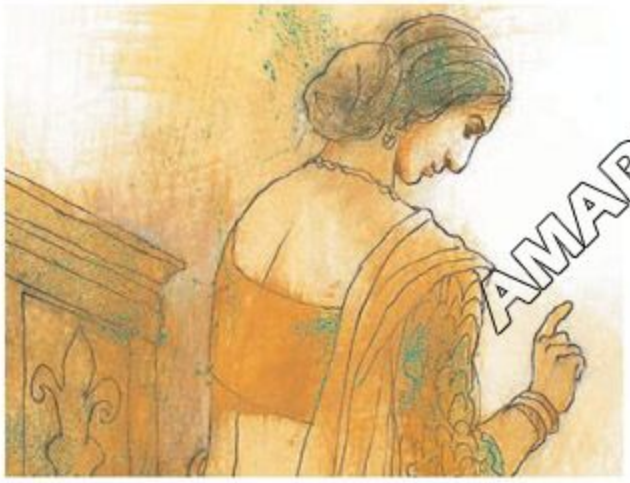

পিনাকেশ বলল, "একটা নিজস্ব হেলিকপ্টার কিংবা ছোট প্লেন পেলে আমার এই কাজের অনেক সুবিধে হত, কিন্তু কে আমাকে সাহায্য করবে? দু'-একজনকে বলে দেখেছি, কোনও শালাই আমাকে সাহায্য করবে না, তার বদলে হাসে। আমি নিজে-নিজেই একটা ব্যবস্থা করেছি। এরকম টানা বৃষ্টির দিনে আকাশটা অনেক নীচে নেমে আসে। আসলে আকাশ বলে তো কিছু নেই, নেমে আসে মেঘ। দার্জিলিং-এ দেখিসনি, মেঘ ঘরের মধ্যে ঢুকে আসে। তখন হাত দিয়েই সে মেঘ ছোঁয়া যায়।"

আমি বললাম, "আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। বৃষ্টি থামাবার জন্য সবাইকে দার্জিলিং যেতে হবে? যদি যেতে না দেয়?"

পিনাকেশ বলল, "দুর বোকা, দার্জিলিং ছাড়া কি কোনও উঁচু জায়গা নেই? তা ছাড়া আমি এমন ব্যবস্থা করেছি, এরকম ছাদ থেকেও মেঘ ছোঁয়া যাবে। তোকে সেটাই ছোট করে দেখাচ্ছি।"

এই সময় ছাদের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন শিবানীদি। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি শিবুর ভাই নিলু? আমাকে আগে বলোনি কেন? তোমার মা নারকোল নাড়ু খেতে খুব ভালবাসেন। বেশ ক'টা করে রেখেছি, আর পাঠানোই হচ্ছে না। আজ যাওয়ার সময় নিয়ে যেও।"

তারপরই দু'চোখে ঝিলিক তুলে তিনি বললেন, "এখানে বসে-বসে তুমি কি এই দাদার পাগলামি দেখছ?"

এই কথাটা শুনে পিনাকেশদা বেশ চটে গেল। বোঝাই যায়, এই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ঠান্ডা লড়াই চলছে।

পিনাকেশদা গর্জন করে বলল, "পাগলামি? না, পাগলামি! এর পর যখন আমি নোবেল প্রাইজ পাব, কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা আসবে। তখন তুমিই দু' হাত তুলে নাচবে।"

তীব্র শ্লেষের সঙ্গে শিবানীদি বললেন, "ও, তুমি নোবেল প্রাইজ পাবে বুঝি? তা হলে তো তার আগেই আমাকে নাচ শিখে নিতে হবে?"

পিনাকেশদা রাগে গরগর করতে-করতে ঢুকে গেল ঘরটার মধ্যে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরে এল একটা বেশ বড় ধনুক আর কয়েকখানা তির নিয়ে। এই তিরের ডগায় ধারাল ফলা নেই, তার বদলে আছে একটা কলকের মতো জিনিস, অনেকটা ফাঁক করা।

সে একটা তিরের সেই কলকেটার মধ্যে তার সসপ্যানে যা ফুটছে, তার খানিকটা ভরে নিল। তারপর সে ছাদের মাঝখানটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ধনুকে সেই তিরটা পরাবার চেষ্টা করে পোজ় নিল। পিনাকেশদাকে এই চেহারায় তো আগে কখনও দেখিনি, ঠিক মনে হচ্ছে যেন হাফ-প্যান্ট পরা অর্জুন!

বেশ কিছুক্ষণ সেই ভাবে, চোখ কুঁচকে টিপ ধরে তিরটা ছুড়ল পিনাকেশদা। পিনাকেশদা বলল, "মিনিট পাঁচেক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর, তারপরেই দেখবি কী সব কাণ্ড শুরু হবে আকাশে।"

শিবানীদি বললেন, "আ হা হা, কিছু কাণ্ড হবে না ছাই হবে! ওঃ, এই বাতিকের জন্য কত টাকা যে বাজে খরচ হচ্ছে!"

আমরা সাত-আট মিনিট ধরে নিঃশব্দে বসে রইলাম। সত্যিই কিছু ঘটল না। আকাশের অবস্থা একই রকম, বৃষ্টিও পড়েই চলেছে।

পিনাকেশদা অনেকটা আপন মনেই বিড়বিড় করে বলল, "তিরটা বোধ হয় বেশি দূর যায়নি। এবার আরও জোরে। আর-একটা তির নিয়ে পিনাকেশদা হাঁটু গেড়ে বসে আরও ভাল পোজ় নিয়ে সেটা ছুড়ল। আবার সাত-আট মিনিট অপেক্ষা। কিছুই ঘটল না। নো লাক?

আবার একটা তির জোড়া হল ধনুকে। পিনাকেশদা সেই ফুটন্ত কেমিক্যাল অনেকখানি ঢেলে দিল সেই ধনুকের ডগায়।

শিবানীবউদি বললেন, "এইবার ক্ষ্যামা দাও বাপু! চলো নীচে যাই, তোমরা চা খাবে না?"

পিনাকেশদা আবার প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বলল, "তোমার ইচ্ছে হয় তো তুমি যাও, নিলু যাবে না, ওকে আমি দেখাবই। এর আগে পাঁচ-ছ'বার আমি দেখেছি।"

শিবানীদি বললেন, "না, তুমি একবারও দ্যাখনি। ওসব তোমার কল্পনা। কোনওবার এমনিই বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। জানিস নিলু, এখন মাঝে-মধ্যেই ঘুমের মধ্যে নোবেল প্রাইজ়, নোবেল প্রাইজ় বলে চেঁচিয়ে ওঠে।"

চতুর্থ তিরের সময় সত্যিই একটা চমকপ্রদ ব্যাপার হল। বিকেল শেষ হয়ে সন্ধে নেমে এল প্রায়। আকাশে রয়ে গেল সরু একটা রুপোলি রেখা। দলবেঁধে ঘরে ফিরছে পাখিরা। অনেক উঁচু দিয়ে যাচ্ছে বকের পাঁতি, ভাল বাংলায় যাদের বলে বলাকা। আর অনেকটা নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে কাকেরা, তাদের কোনও ভাল নাম নেই। পিনাকেশদা একটা তির লাগাল সেই কাকের দলের একটার গায়ে। সে বেচারি আহত অবস্থায় দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খানিকটা ওড়ার চেষ্টা করল, উলটোপালটা ডিগবাজি খাচ্ছে শুধু। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সে ধপাস করে পড়ল টিনের চালে। তারপর

AMARBOI.COM

পড়ল ছাদের ঠিক মাঝখানটায়। একেবারেই মরে গিয়েছে।

অসীম বিরক্তিতে পিনাকেশদা বলে উঠল, " এই শুয়োরের বাচ্চাটা মরতে এখানেই এল কেন?"

কোনও কাককে 'শুয়োরের বাচ্চা' বলে গালাগালিটা সঠিক কি না সেটা আমি ভাবতে-ভাবতেই পিনাকেশদা কাকটাকে তুলে ছুড়ে ফেলে দিল। সেটা কিন্তু পাঁচিলের বাইরে গেল না, পড়ল পাঁচিলের একধারে একটা ফুলগাছের টবে। সঙ্গে-সঙ্গে দুটো কাক সেখানেই পাঁচিলের উপর এসে বসল। তার পরেই আরও তিনটে। শিবানীদি দৌড়ে গিয়ে স্বামীর একটা হাত ধরে বললেন কাতর গলায়, "ওগো, এখন নীচে চলো, প্লিজ, প্লিজ।"

পিনাকেশদা ওঁর হাত ছাড়িয়ে লাফাতে-লাফাতে বলতে লাগল, "না, আমি যাব না, কিছুতেই যাব না, আমার এতদিনের সাধনা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? যাব না!"

এর মধ্যেই আকাশ ছেয়ে গিয়েছে কাকে, আর তাদের ডাকে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। অন্তত পঁয়তিরিশ-চল্লিশটা তো হবেই। এ পাড়ায় যে এত কাকের বাস, তা আগে কল্পনাও করা যায়নি।

কাকেদের সঙ্ঘবদ্ধতা বা তাদের শোকসভার কথা আগে শুনেছি বটে, দেখিনি কখনও। আলফ্রেড হিচককের 'বার্ডস' নামে একটা পুরনো সিনেমায় দেখেছি, শত শত সাধারণ পাখি এককাট্টা হয়ে কখনও মানুষের সঙ্গে লড়াইয়ে লাগতে পারে। এও তো দেখছি সেই রকমই ব্যাপার।

পিনাকেশদা খালি হাতে কাক তাড়ানোর চেষ্টা করছে আর কয়েকটা কাক ঠোক্কর দিচ্ছে তার মাথায় ও ঘাড়ে। এবার আমি ও শিবানীদি একসঙ্গে ওকে দরজার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি, তবু ঠিক পারছি না, ওর গায়ে এখন যেন অসুরের শক্তি আর কুৎসিত সব গালাগালি দিচ্ছে কাকেদের।

উলটে গেল স্পিরিট ল্যাম্পটা। সসপ্যানটা পড়ল মাটিতে। লন্ডভন্ড হয়ে গেল অনেক দরকারি কাগজ ও জিনিসপত্র। আমিও মাথায় ঠোক্কর খেলাম কয়েকবার। অতিকষ্টে দু'জনে মিলে ঠেলতে-ঠেলতে ওকে নিয়ে গেলাম খোলা দরজার কাছে। ভিতরে ঢুকেই চেপে বন্ধ করলাম দরজাটা। পিনাকেশদার শরীরে কয়েকটা রক্তের ধারা। সে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল।

॥ ৬ ॥

তারপর আর কী হবে? পিনাকেশদাকে ভর্তি করে দেওয়া হল একটা নার্সিংহোমে। তার পাগলামির চিকিৎসার জন্য। অবশ্য আশার কথা এই যে, ডাক্তাররা জানিয়েছে, পিনাকেশদা পুরো পাগল হয়নি। আজকালকার যেটা রাজরোগ, সেই ডিপ্রেশনে ভুগছে। ভাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নব্বই পারসেন্ট। শিবানীদি এখন প্রায় সর্বক্ষণই বসে থাকেন তাঁর স্বামীর পাশে।

দাদা বলল, "তুই ভাগ্যিস ওই সব আজেবাজে কাগজপত্র নিয়ে আসিসনি। ওই সব ফর্মুলা ও আগেও কয়েকটা অফিসে পাঠিয়েছে। নোবেল প্রাইজ় তো মাত্র কয়েকজন পায়, আর কত লোক যে ওই লোভে পাগল হয়ে যায়।"

অরিজিৎদার বাড়ির খবরও মোটামুটি ভালই। তবে দু'দিন ধরে প্রথমার কোনও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। সে জামসেদপুরেও ফিরে যায়নি, কলকাতাতেও নেই, তা হলে সে কোথায় গেল?

তবে সে তো অন্য গল্প!

ছবি: সুব্রত চৌধুরী

AMARBOI.COM